কাজী আনোয়ার হোসেনের

কুয়াশা সিরিজ—৭৮

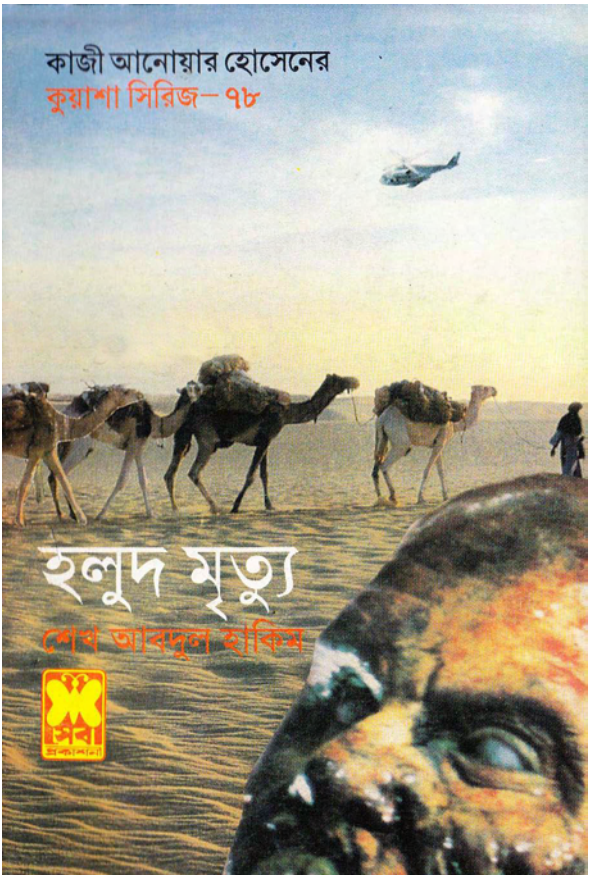

হলুদ মৃত্যু

শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

এক

শহীদ খানের গোয়েন্দাগিরি স্রেফ একটা শখ বা খেয়াল, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্য নিয়ে রহস্য-রোমাঞ্চের গন্ধ শুঁকে বেড়ায়। এই শখ মেটাতে গিয়ে মাঝে মধ্যে জটিল ধাঁধার মধ্যে পড়তে হয় তাকে, সেই ধাঁধা থেকে বেরুতে দরকার হয় ক্ষুরধার বুদ্ধি। আবার কখনও বা বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলায় অশুভ শক্তি ওকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর দোরগোড়ায়, তখন আর শুধু বুদ্ধিতে কুলায় না, প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দরকার হয় গায়ের জোর আর অস্ত্রের সাহায্য। বুদ্ধির মাপকাঠিতে অসাধারণ একটা প্রতিভা হিসেবে সারা দেশে স্বীকৃতি আছে তার। নিয়মিত ব্যায়াম ও কঠোর অনুশীলনের নগদ প্রাপ্তি হলো জুডো, কারাতে, বক্সিং অর্থাৎ আনআর্মড কমব্যাটে সে অপ্রতিদ্বন্দী। অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে স্মল আর্মস ও রাইফেল শূটিঙে হাত ওর খুবই ভাল।

এত সব গুণ আর দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে এমন দু'একটা কঠিন বিপদে পড়তে হয়, যে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সত্যি কোন রাস্তা খোলা থাকে না। অপরাধী অর্থাৎ অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে আর যারা লড়াই করে তাদের সঙ্গে শহীদের একটা পার্থক্য আছে, সেটা হলো শহীদ এ-ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদের সময় অন্য এক বিরল প্রতিভার সাহায্য পায়। বলাই বাহুল্য, সেই বিরল প্রতিভা নিজেই একটা মূর্তিমান রহস্য। সেই রহস্যের নামই কুয়াশা।

কুয়াশা মানবকল্যাণে নিবেদিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন। বহুমুখী প্রতিভা বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তাই, বিজ্ঞানের একটি মাত্র শাখা নিয়ে পড়ে থাকতে তার মন সায় দেয় না। কুয়াশা আসলে মানুষের অবিশ্বাস্য স্বপ্নগুলো পূরণের জন্যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মানুষ একদিন হবহু তারই মত মানুষ তৈরি করতে পারবে, মানুষের আয়ু হবে কমপক্ষে বিশ হাজার বছর, তারুণ্য ও যৌবন হবে চিরস্থায়ী, আক্রান্ত হবার আগেই শরীর থেকে ক্যান্সার ও এইডস জিন শনাক্ত করা ও বের করে নেয়া সম্ভব হবে, আলোর চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন স্পেশশীপে চড়ে মানুষ একদিন এক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়াবে, এই গতিই তাকে সুযোগ করে দেবে অতীত থেকে বেড়িয়ে আসার, এমন কি ভবিষ্যৎ দেখে আসারও। স্বপ্নগুলো যতই অবিশ্বাস্য আর অবাস্তব মনে হোক, এগুলোই কুয়াশার গবেষণার বিষয়। সাধারণ মানুষ হয়তো এ-সব শুনে হেসেই খুন হবে, কিন্তু বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে যারা খবর রাখে তারা জানে আধুনিক মানুষের এ-সব স্বপ্ন একদিন সত্যি সত্যি পূরণ হতে যাচ্ছে। একদিন মানে অনির্দিষ্ট কাল বোঝায় না। আজ যেটাকে অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছরের মধ্যে সেটাকে বিজ্ঞানীরা বাস্তব সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দেখাবেন। সারা পৃথিবী জুড়েই বিজ্ঞানীরা গবেষণায় মেতে আছেন, সাফল্য পাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কুয়াশার সঙ্গে আর সব বিজ্ঞানীর পার্থক্য হলো, তার সঙ্গে ওঁদের গবেষণা পদ্ধতি মেলে না। উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্যে সরকার অথবা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। ওঁদের একেকটা প্রজেক্ট দশ বা বিশ বছর মেয়াদী। কিন্তু কুয়াশা কোথাও থেকে কোন টাকা সাহায্য পায় না, তাই একদিকে তাকে টাকার সন্ধানে থাকতে হয়, আরেক দিকে

খেয়াল রাখতে হয় সম্ভাব্য কত কম সময়ের ভেতর প্রতিটি গবেষণা শেষ করা যায়। টাকা যোগাড় করার জন্যে মাঝে মধ্যে মরিয়া হয়ে ওঠে সে, দেশের কুখ্যাত ঋণ খেলাপিদের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ যা পায় ছিনিয়ে আনে। কিংবা হেরোইন আর ব্রীফকেস ভর্তি টাকা হাতবদল হওয়ার সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত উদয় হয়, দেশ ও দশের শত্রুদের কাবু করে কেড়ে নেয় সব। কুয়াশার 'এক্সপেরিমেন্ট' পদ্ধতিও আলাদা, অনেক সময় গিনিপিগ হিসেবে মানুষকেই 'মডেল' হিসেবে গ্রহণ করে সে। এই গিনিপিগ করা হয় বেশিরভাগই অপরাধ জগতের লোকজনকে। এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হলে তাদের অনেককেই অকালে মারা যেতে হয়। এ-ব্যাপারে কুয়াশা বিবেকের কোন দংশন অনুভব করে না। কিন্তু সরকার তো আর ডাকাতি বা এক্সপেরিমেন্টের নামে মানুষ হত্যা মেনে নিতে পারে না। এখানেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে কুয়াশার বিরোধ। কুয়াশাকে ধরার জন্যে, কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা; আর কুয়াশা তাদের পাতা ফাঁদ এড়াবার জন্যে যত রকম কৌশল আছে সব ব্যবহার করছে।

কুয়াশাকে তাই একটা মরীচিকা বলা হয়। হঠাৎ কখন তাকে কোথায় দেখা যাবে কেউ তা বলতে পারে না। অনেক সময় দেখেও চিনতে পারা যায় না। তাকে নিয়ে তাই গুজবেরও কোন শেষ নেই। অনেকেরই ধারণা, কুয়াশা অদৃশ্য হতে জানে। গুজব বা রহস্য, যাই বলা হোক, সম্পূর্ণ সত্য হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না, অন্তত কুয়াশা পুলিসের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত। তবে ধরতে যদি কোনদিন পারেও, পুলিস তাকে কতদিন বা কত ঘণ্টা আটকে রাখতে পারবে সেটাও একটা প্রশ্ন বটে।

ঘটনার সূত্রপাত হলো উচ্ছ্বাস আর আনন্দময় পরিবেশে, তাতে

রহস্য বা খুন-খারাবির ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বেশ কয়েক বছর ধরেই আর্কিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করছিল কামাল, শহীদ খানের বাল্যবন্ধু ও সহকারী। এ-বিষয়ে তার অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন না থাকলেও, পত্র-পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে দেশে-বিদেশে বেশ নাম করেছে। সেই সূত্রেই অ্যামেচার আর্কিওলজিস্টদের একটা সেমিনারে যোগ দিতে আমেরিকায় গিয়েছিল, সেখান থেকে পিরামিড নিয়ে গবেষণা করার জন্যে পৌঁছেছে মিশরে। কায়রো থেকে শহীদকে একটা চিঠি লিখেছে সে। তাতে পিরামিড, প্রাচীন মমি, স্ফিংস ইত্যাদি সম্পর্কে রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়ে আহ্বান জানিয়েছে, ঢাকা থেকে শহীদ যেন সবাইকে নিয়ে কায়রোয় বেড়াতে আসে। এ-সব প্রাচীন মিশরীয় নিদর্শন দেখার শখ মেটাবার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ, যেহেতু ওরা তাকে গাইড হিসেবে কায়রোতেই পাবে।

চিঠিটা পড়ে শহীদ তেমন উৎসাহ দেখায়নি, কিন্তু মহুয়া আর লীনা প্রায় নাচতে শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল রাসেলও। শহীদ খরচের কথা তুলে বাদ সাধার চেষ্টা করল, কিন্তু মহুয়া আর লীনা সেটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলল, ওদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা আছে, দরকার হলে সেই টাকা খরচ করতেও তাদের আপত্তি নেই, অর্থাৎ পিরামিড দেখার জন্যে কায়রোয় তারা যাবেই। বেড়ানোর এই শখ আসলে সংক্রামক, এক পর্যায়ে শহীদের মত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষও তাতে আক্রান্ত হলো। শখের গোয়েন্দাগিরির নামে দশটা-পাঁচটা অফিস করতে করতে সে-ও হাঁপিয়ে উঠেছে, অপরাধীদের পিছু ধাওয়া হয়ে উঠেছে একঘেয়েমিতে ভরা একটা রুটিন ওঅর্ক, কাজেই সব ছেড়েছুঁড়ে দিন কয়েক বেড়িয়ে আসতে পারলে শরীর ও মন দুটোরই উপকার করা হবে। তবে উৎসাহ আর পুলক গোপন রাখল সে, গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সবাই

যখন বলছ, চলো বেড়িয়ে আসা যাক।' মনের প্রকৃত ভাব চেপে রাখাটা পেশার খাতিরে একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটল না।

সব কিছু সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হলো। সবারই পাসপোর্ট করা আছে, ভিসা সংগ্রহ করতে এক হপ্তার বেশি লাগল না। ট্রাভেল অফিসে গিয়ে টিকিটও কনফার্ম করে এল রাসেল। বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে যাচ্ছে, কাজেই মহুয়া তার দাদা অর্থাৎ কুয়াশাকে একটা খবর দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার জানা কোন ঠিকানাতেই পাওয়া গেল না কুয়াশাকে। শহীদ সব শুনে বলল, সে বোধহয় দেশে নেই।

নির্দিষ্ট দিনে প্লেনে চেপে বসল ওরা। কামালের হোটেলে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছে, তাতে ওদের ফ্লাইট নম্বর জানিয়ে বলা হয়েছে সে যেন ওদেরকে তুলে নেয়ার জন্যে একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে এয়ারপোর্টে।

আনন্দভ্রমণের মজাই আলাদা। পিরামিড, মমি, যাদুঘর, স্ফিংস দেখার স্বপ্নে বিভোর সবাই। করাচী ও বাহরাইন হয়ে কায়রোয় পৌঁছাল ওদের প্লেন। হৈ-চৈ করতে করতে প্লেন থেকে নেমে এল সবাই। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কোন ঝামেলাই পোহাতে হলো না, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল অফিসাররা। গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লীনার মুখ, বলল, 'শহীদ ভাইকে নিশ্চয়ই ওরা চিনতে পেরেছে, জানে খুব নাম করা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তা না হলে এত খাতির...'

কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে মুখ ঝামটা দিয়ে মহুয়া জবাব দিল, 'ঘোড়ার ডিম! আরে বোকা, মৌলবাদীদের হুমকির মুখে মিশরে ট্যুরিস্ট আসা প্রায় বন্ধ। ঝুঁকি নিয়ে আমরা এসেছি, সরকার কিছু ডলার কামাবে, তাই এত খুশি ওরা। তোমার ভাইকে চিনতে

ওদের বয়েই গেছে!'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা লাগল অ্যারাইভাল লাউঞ্জে পৌঁছানোর পর। অনেক খুঁজেও কামালকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আরও একটা প্লেন এসে ল্যান্ড করেছে, লাউঞ্জে লোকজনের ভিড় বেড়ে গেল। কামালকে দেখতে না পেয়ে ওরা সবাই খুব চিন্তিত। এয়ারপোর্টে তার না আসার কোন কারণই নেই। তবে কি কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে কামাল? একটা ট্যাক্সি নিয়ে কামালের হোটেলে ওঠার প্রস্তাব দিল রাসেল। শহীদ বলল, আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। এই সময় ভিড় থেকে কেউ একজন ছোট্ট একটা কাগজ গুঁজে দিল শহীদের হাতে। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু আশপাশে এত লোক যে কাজটা কে করল বুঝতে পারল না।

কাগজটার ভাঁজ খুলে শহীদ দেখল তাতে কয়েকটা কথা লেখা রয়েছে। হাতের লেখা অত্যন্ত পরিচিত, তবে কামালের নয়। চিরকুটে লেখা হয়েছে–

'শহীদ,

বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাড়াহুড়ো করবে না, ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান ধরে কাজে নামবে, তা না হলে কামালকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমার ধারণা তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। পুলিসের সাহায্য চেয়ে কোন লাভ নেই, যা করার তোমাদেরকেই করতে হবে। কামালের হোটেলে না উঠে তোমরা বরং ব্লু নাইল-এ ওঠো। আমি আমার গবেষণা নিয়ে এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত, তবে হাতের কাজটা শেষ হওয়া মাত্র তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব। আমি তোমাকে কোন সূত্র দিয়েও সাহায্য করতে পারছি না। শুধু জানি তামামা নামে এক লোকের সঙ্গে তাকে ফারাও জুব্বাহ্ নেদ-এর পিরামিডের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা

গিয়েছিল। সাবধান, তামামা লোকটা ভয়ঙ্কর। শুভেচ্ছা নিয়ো। ইতি, কুয়াশা।'

হরিষে বিষাদ আর কাকে বলে! শহীদের চেহারা ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল। চিরকুটটা রাসেলের হাতে ধরিয়ে দিল সে। মহুয়া আর লীনাও হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজটার ওপর।

পড়া শেষ হতে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল মহুয়ার। কামালকে আপন ভাইয়ের মতই স্নেহ করে সে।

'এখন কি হবে!' নিস্তব্ধতা ভাঙল লীনা। কামালের সঙ্গে তার একটা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার আছে।

'এখন আমাদেরকে শক্ত হতে হবে,' ভারী গলায় বলল শহীদ। 'চলো আগে ব্লু নাইলে উঠি, তারপর প্ল্যান করতে বসব।'

রাসেল বলল, 'শহীদ ভাই, আমরা অস্ত্র নিয়ে আসিনি, তার কি হবে?'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল শহীদ। 'কায়রোর চোরা বাজারে শুধু অস্ত্র কেন, বাঘের চোখও কিনতে পাওয়া যায়।'

কিশোর বয়েসে কায়রোর উপকণ্ঠে ভিস্তিওয়ালা ছিল তামামা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে পানি বিক্রি করত। আয়-রোজগার কম, দিন চলে না, অথচ স্বপ্ন দেখে একদিন সে বিরাট ধনী হয়ে রাজ-রাজড়াদের মত জীবনযাপন করবে। অল্প সময়ে অনেক রোজগার করতে হলে চুরি বিদ্যায় হাত পাকাতে হয়, ধনী হবার এই সহজ ও অসৎ পথটাই বেছে নিল সে। কিন্তু কথায় বলে চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন। হাতে-নাতে ধরা পড়ে বেদম মার খেলো তামামা। কিন্তু তার নিষ্ঠা আছে, আছে মার খাবার সহ্যক্ষমতা, চুরি করার নিত্য-নতুন কৌশল আবিষ্কারেও তার জুড়ি মেলা ভার। এক সময় পানি বিক্রি ছেড়ে দিল সে, চুরি করাটাই হয়ে উঠল তার পেশা। দেখতে

সে কালো, তবে লম্বায় প্রায় ছ'ফুট, মার খেয়ে খেয়ে সারা শরীর দাগে ভরে গেছে। যুবা বয়েসে বোধোদয় হলো তার, ছিঁচকে চোর হয়ে কোন লাভ নেই, ধনী হতে হলে বড় দাও মারতে হবে। এক ওস্তাদ ধরল সে, তার কাছে কাজ চালাবার মত ইংরেজি শিখল, আর শিখল ছুরি চালানো। কিছুদিন পর দেখা গেল রাস্তা-ঘাটে ছিনতাই শুরু করেছে সে। নির্জন রাস্তায় একা কোন ট্যুরিস্টকে পেলে ছুরি মেরে আহত করে, তারপর তার সবকিছু কেড়ে নিয়ে পালায়। দিনে দিনে সাহস বাড়ল তার, পুলিসকে ঘুষ দিতে শিখল, ছিনতাইয়ের পাশাপাশি শুরু করল চাঁদাবাজি। এক সময় গোটা এলাকার টপ টেরর হয়ে উঠল সে।

তামামা-র জন্ম মিশরে নয়, লিবীয়ার ঊষর মরুভূমিতে। সে এক বেদুইন পরিবারের ছেলে। লোকে অবশ্য বলে, তার বাপ ছিল চতুর শিয়াল, আর মা ছিল সুদর্শনা এক সাপ।

সে যাই হোক, অসৎ পথে ভালই রোজগার করেছিল সে। দামী গাড়ি হাঁকাত, তার কাপড়-চোপড় আসত লন্ডন থেকে, সেন্ট আসত প্যারিস থেকে। কায়রো শহরের অভিজাত এলাকায় প্রাসাদতুল্য একটা অট্টালিকাও বানিয়েছিল। কিন্তু লোভী অসৎ লোকদের যা স্বভাব, সন্তুষ্ট হতে জানে না, জানে না কোথায় থামতে হয়। বিপুল অর্থকড়ির মালিক হবার পরও পুরানো অভ্যাস ছাড়তে পারেনি সে, একদিন ভুল করে খোদ প্রেসিডেন্টের এক মেয়ের হাতব্যাগ ছিনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল পুলিসের হাতে। এই কেসে পুলিস তো আর ঘুষ খেতে পারে না। তার বিরুদ্ধে স্পেশাল ব্রাঞ্চ তদন্ত শুরু করল। ইন্টারোগেশনের মুখে নিজের সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করল তামামা। বিচারে তার পাঁচ বছরের জেল হয়ে গেল, সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হলো সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তামামা দেখল, তার হাত খালি।

আবার নতুন করে শুরু করতে হবে তাকে। কায়রো শহর ছেড়ে আবার শহরতলিতে ফিরে এল সে, তার পুরানো ঠিকানায়, যেখানে অপরাধে তার হাতেখড়ি। এখানে সবাই তাকে ভয় করে, ঘুষের আশায় এখানকার পুলিসও তাকে সমীহ করে।

পুরানো এলাকায় ফিরে এসে বিপজ্জনক হলেও টাকা কামাবার ভাল একটা লাইন পেয়ে গেল তামামা। এক বছরও পার হয়নি, বেশ ভালই কামিয়েছে। কিন্তু পুরানো অভ্যাসটা আজও সে ছাড়তে পারেনি।

সেদিন সকাল দশটায় মির্জা স্ট্রীটের হোটেল গুলিস্তান থেকে সুটেডবুটেড হয়ে বেরুল তামামা, উদ্দেশ্য শিকার ধরা। হোটেলের বুড়ো দারোয়ান আমির আলিকে কড়কড়ে একটা দশ ডলারের নোট বকশিশ দিল সে। 'ভাল-মন্দ কিছু কিনে খেয়ো, বুড়ো বাপ,' বলে রাস্তায় নামল।

তামামা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বুড়ো আমির আলি। তারপর দশ ডলারের নোটটায় এক দলা থুথু ছিটাল সে, যেন তাতেই নোটটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোমর থেকে লম্বা একটা ছুরি বের করল বুড়ো, ফলা দিয়ে বিদ্ধ করল কাগজটাকে, কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করল ঠিক এভাবে তামামার বুকে ছুরি মেরেছে সে। ছ'মাস আগে তার মেয়েকে নিয়ে হানিমুনে গিয়েছিল তামামা, ফিরে আসে একা। মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে তামামা জবাব দিয়েছে, কলেরায় মারা গেছে তার মেয়ে। কিন্তু বুড়ো আমি আলির বিশ্বাস, দুর্গম মরুভূমিতে, আজও যেখানে ক্রীতদাসী কেনাবেচার বাজার বসে, সেখানে তার মেয়েকে বিক্রি করে দিয়েছে তামামা। সেই থেকে তাকে খুন করার বুদ্ধি আঁটছে বুড়ো, কিন্তু কিভাবে মারলে তামামা সবচেয়ে বেশি ভুগবে সেটা ঠিক করতে না পারায় আজও কাজটা শেষ করতে পারেনি।

চারদিন পরের ঘটনা।

একা একটা বিদেশী মেয়ে, হাতব্যাগ থেকে টাকা বের করে ফুটপাথ থেকে ভিউ কার্ড কিনছে, দেখেই লোভে চোখ দুটো চকচক করে উঠল তামামার। দূর থেকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল মেয়েটিকে। না, সঙ্গে কোন সঙ্গী নেই। বাহ্, কপালটা দেখা যাচ্ছে কালকের মতই ভাল! কালও সে এক আমেরিকান ট্যুরিস্ট মেয়েকে একা পেয়ে ভাল আয় করেছে।

এলাকার সবাই তাকে চেনে। ভয়ে কেউ তার কাজে বাধা দিতে আসবে না। তবে ভিড়ের মধ্যে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক লুকিয়ে থাকতে পারে। ওদেরকে তার সাংঘাতিক ভয়। সেজন্যেই আজকাল ছিনতাই করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে সে, শিকারকে প্রথমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন কোথাও সরিয়ে এনে কাজ সারে। বিদেশী মেয়েটিকে দেখে শুধু টাকা নয়, তার মনে অন্য রকম নোংরা লোভও জাগল। সম্ভব হলে মেয়েটিকে কিছুদিন বন্দী করে রাখবে। তারপর মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে নিলামে তুলে বিক্রি করবে। সালোয়ার কামিজ দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয় মেয়ে, নিশ্চয়ই নাচ-গান ভালই জানে। নাচ-গান জানা মেয়েদের বাজারদর খুব বেশি। সৌদি আরব আর আরব আমিরাতের শেখ ও আমীররা চড়া দামে তাদেরকে কিনে নিয়ে যায় ব্যক্তিগত হেরেমের মর্যাদা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

মানিব্যাগ থেকে একটা বিশ ডলারের নোট বের করল তামামা। নোটটা মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে ধরে আরবীতে বলল, 'এটা আপনার। ব্যাগ থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

চমকে ঘাড় ফেরাল মেয়েটি। 'কি?'

তামামা সবিনয়ে হাসল। 'আপনার টাকা। ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে। নিন।'

মেয়েটি দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি আমাকে টাকা দিচ্ছ কেন।' ইংরেজিতে কথা বলছে সে। 'তুমি ইংরেজি জানো না?'

এক গাল হাসল তামামা। 'ইংরেজি আমি জানি, তবে অল্প স্বল্প। এই টাকাটা নিন, বোধহয় আপনার ব্যাগ থেকেই পড়ে গেছে...'

হাতব্যাগ খুলে ভেতরটা একবার দেখে নিল তরুণী, তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'না তো!'

হাতব্যাগের ভেতর প্রচুর ডলার দেখে একটা ঢোক গিলল তামামা। 'বলছেন আপনার টাকা নয়? তাহলে সত্যি আমি দুঃখিত। নিশ্চয়ই অন্য কেউ ফেলে গেছে। পুলিসকে দেয়াই ভাল, কি বলেন? তারাই খুঁজে বের করুক কার টাকা হারিয়েছে।'

হাতছানি দিয়ে ডাকতেই একজন পুলিস অফিসার রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে এল। তার হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়ে গল্পটা শোনাল তামামা–এটা সে কুড়িয়ে পেয়েছে, ভেবেছিল ট্যুরিস্ট লেডি ফেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু উনি বলছেন তাঁর কোন টাকা পড়েনি। অফিসার কি টাকার প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবেন, প্লীজ?

আরবীতে তামামাকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিল অফিসার, তবে টাকাটা তাড়াতাড়ি পকেটে ভরতে ভুল করল না। সে তামামাকে চেনে, দূর থেকে সব দেখেছেও, এ-ও জানে যে টাকাটা আসলে তাকে ঘুষ দিচ্ছে তামামা। গালি খেয়ে অফিসারের উদ্দেশে মাথা নত করে সম্মান দেখাল তামামা, ট্যুরিস্ট তরুণীর দিকে ফিরে বলল, 'পুলিস অফিসার আমাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, বলছেন প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করে টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন।' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সে। 'বাহ্, কি সুন্দর! ভিউ কার্ডের বেশিরভাগ ছবিই তো দেখছি উট আর পিরামিডের। আপনার রুচির প্রশংসা

করতে হয়।'

মুচকি একটু হাসল তরুণী। তামামার উদ্দেশ্য ছিল ট্যুরিস্ট তরুণীর কাছে প্রমাণ করা যে সে একজন সৎ লোক। সেটা সফল হয়েছে। 'আপনি বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাই না? নাকি শুধু কেনাকাটা করার ইচ্ছে? সাবধান কিন্তু, চারদিকে ঠকবাজ লোকজন ওত পেতে আছে। দরদাম না করে কোন জিনিস কিনবেন না।'

'বেড়াতেই বেরিয়েছি,' বলল তরুণী। 'কায়রো ভারি সুন্দর শহর।'

'ঘুরতে যখন বেরিয়েছেন, আপনার তাহলে উটদের স্কুলটা সবার আগে দেখা দরকার,' বলল তামামা।

'উটদের স্কুল?'

'উটদের স্কুল মানে ওখানে ওদেরকে গান শেখানো হয়।'

'কি বলছেন! উটরা গান শেখে?'

'শেখে না মানে? ওরা আমার-আপনার চেয়ে ভাল গান করে। সে আপনি না দেখলে বুঝবেন না। চলুন আপনাকে দেখাই। আমিই তো ওই স্কুলের হেডমাস্টার।'

একটু ইতস্তত করে চারপাশে চোখ বোলাল তরুণী, তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন। সত্যি আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।'

মেইন রোড ছেড়ে নির্জন একটা রাস্তায় চলে এল ওরা। সামনে একটা গলি। গলির মুখে পৌঁছে তামামা নয়, ট্যুরিস্ট মেয়েটাই এক ঝটকায় টান দিয়ে তামামাকে গলির ভেতর ঢোকাল। জায়গাটা সকালেও প্রায় অন্ধকার। এরকম অন্ধকার গলিতেই লোকজনের গলা কাটে তামামা। কিন্তু আজ ঘটল ঠিক উল্টো ঘটনা। হাতব্যাগ ফেলে দিয়ে কনুই চালাল তরুণী, কারাতের কোপ মারল তামামের

ঘাড় লক্ষ্য করে। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠে তামামাও মারমুখো হয়ে উঠল। ছুরি বের করার সময় পাচ্ছে না, লাথি আর ঘুসি খেয়ে পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে, তারই ফাঁকে চেষ্টা করল মেয়েটির চোখে আঙুল ঢোকাতে। তাতেও কাজ হলো না। তামামার আঙুল ধরে উল্টো দিল তরুণী, ফলে একটা আঙুল মট করে ভেঙে গেল। তার চিৎকার দূরের মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। চিৎকারটা থামল মুখে একটা ঘুসি খেয়ে, সেই ঘুসিতে সামনের সারির দুটো দাঁত ভেঙে গলায় আটকে গেল। কোন রকমে ঢোক গিলে ওগুলো পেটে চালান করে দিতে হলো, তা না হলে দম আটকে মারাই যেত। ইতিমধ্যে মেয়েটি তার লম্বা চুল মুঠোয় ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকাতে শুরু করেছে।

এবার আরেকজন ট্যুরিস্ট হাজির হলো। সুদর্শন এক তরুণ। 'ওকে তুমি ছেড়ে দাও, লীনা,' বলল আগন্তুক তরুণ।

লীনা পিছিয়ে যেতেই সুযোগ পেয়ে গেল তামামা, এক ঝটকায় কোমর থেকে ছুরি বের করল। ছুরিটা আগন্তুকের কাঁধে ঢুকিয়ে দিল সে, ফলাটা গেঁথে গেল একটা বাড়ির কাঠের দরজায়। আগন্তুক দরজার গায়ে আটকা পড়ল। ঘুরে ছুটল তামামা। এত জোরে জীবনে কখনও দৌড়ায়নি সে। এরকম ভয়ও কখনও পায়নি।

গলির মেঝে থেকে হাতব্যাগটা তুলে ভেতরে হাত গলাল লীনা, গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বের করে ধাওয়া করল তামামাকে। পিছন থেকে বাধা দিল আগন্তুক। 'না, লীনা, না!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লীনা। 'না? শয়তানটা পালাচ্ছে!'

'পালিয়ে যাবে কোথায়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল আগন্তুক। 'ব্যাটা আমাকে ছুরি মেরেছে, দেখতে পাচ্ছ না? আগে আমাকে মুক্ত করো।'

'ওহ্, গড!' বলে ছুটে ফিরে এল লীনা। 'রাসেল, আঘাতটা কি সিরিয়াস?' উদ্বেগে কেঁপে গেল গলাটা।

অভয় দিয়ে রাসেল বলল, 'আরে না, শুধু চামড়ায় গেঁথেছে।'

ছুরিটা পরীক্ষা করল লীনা। 'হ্যাঁ, বড় বাঁচা বেঁচে গেছ।' ছুরিটা দরজার গা থেকে খুলে নিল সে। 'আমার উচিত ছিল শয়তানটাকে গুলি করে ফেলে দেয়া।'

'তুমি কি পাগল হলে!' ছেঁড়া শার্ট আরও একটু ছিঁড়ে কাঁধের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রাসেল। 'ওকে আমাদের দরকার।'

তামামা ইতিমধ্যে গলি থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'কিন্তু পালিয়ে তো গেল।'

পালিয়ে যাবে কোথায়! বলে হাসল রাসেল।

ধরা পড়ার ভয়ে এখনও ছুটছে তামামা। কয়েকটা বাঁক ঘুরে চওড়া এক রাস্তায় বেরুতেই সামনে একটা ট্যাক্সি দেখতে পেল সে। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল তার। ট্যাক্সিতে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'চালাও! যত জোরে পারো চালাও!'

ড্রাইভার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এক লোক, বয়েস আন্দাজ করা কঠিন–পঁচিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে। এক চোখে কালো একটা পট্টি বাঁধা, মুখে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, কর্কশ গলায় ধমকের সুরে বলল, 'পঞ্চাশ ডলার! দেশী টাকা আমি নিই না।'

'ব্যাটা শিয়াল! উজবুক কাঁহাকা! গাড়ি ছাড়, তা না আমি তোর...'

'একশো ডলার,' ভাড়া বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার।

'কি? এক শো ড...' বিষম খাবার অবস্থা হলো তামামার। 'ঠিক আছে, তাই দেব, চালা।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করল ড্রাইভার। 'আগে ভাড়া।'

পকেট থেকে একশো ডলারের একটা নোট বের করল তামামা। 'তুমি একটা চোর, শালা!'

খিকখিক করে হাসল ড্রাইভার। 'শক্ত হয়ে বসো,' সাবধান করে দিল সে।

গাড়ি চলতে শুরু করল। পিছনের সীটে হেলান দিয়ে কপালের ঘাম মুছল তামামা। একটু সুস্থির হতে ড্রাইভারের দিকে মনোযোগ দিল সে। আরবী উচ্চারণ শুনে ধরে নেয়া চলে লোকটা কোন বেদুইন পরিবারের সদস্য, সম্ভবত নিউবিয়ান অঞ্চল থেকে এসেছে। 'তুমি কায়রোয় নতুন, তাই না?' জানতে চাইল সে।

'হতে পারে,' নির্লিপ্ত স্বরে জবাব দিল ড্রাইভার।

হঠাৎ একটা গলিতে ঢুকে ট্যাক্সি থামাল সে। নিচে নেমে গাড়ির আইডেনটিফিকেশন প্লেট বদলাল। শুধু তাই নয়, ট্যাক্সির এঞ্জিন কাভারটাও বদলে ফেলল। ফ্রন্ট সীটের তলায় রাখা ছিল দ্বিতীয়টা। এত বড় একটা জিনিস রাখার জন্যে নিশ্চয়ই বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্রাইভার কাজ সেরে ফিরে আসতে তামামা বলল, 'তুমি এমন কুকুর, যে আগেও ঘেউ ঘেউ করেছে।'

'তবে মাত্র একশো ডলারের বিনিময়ে আমি ঘেউ ঘেউ করি না,' জবাব দিল ড্রাইভার।

'তোমাকে আমার খুব চালু মাল মনে হচ্ছে,' বলল তামামা। 'আমি হয়তো তোমাকে কাজে লাগাতে পারি।'

'লাভজনক কোন কাজে?'

'অবশ্যই। মোটা লাভ।'

'সেক্ষেত্রে আমি বিবেচনা করে দেখতে রাজি আছি,' উৎসাহ নিয়ে বলল ড্রাইভার।

'কাজটা এখুনি করতে হবে,' বলল তামামা।

একটু ভেবে নিয়ে ড্রাইভার বলল, 'ঠিক আছে। কি কাজ?'

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল তামামা। 'ক্লিওপেট্রা রোডের

শেষ মাথায়, চৌরাস্তা থেকে তিন কিলোমিটার দূরে, লাল একটা বাড়ি আছে, ওখানে নিয়ে চলো আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো ড্রাইভার। গলিগুলোকে পাশ কাটাবার সময় নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে থাকল সে। একটা গলিতে সবুজ রঙের ট্যুরিং কার দাঁড়িয়ে আছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলেও সরাসরি সেটার দিকে তাকাল না।

ট্যুরিং কার গলি থেকে বেরিয়ে এল। আপনমনে হাসল ড্রাইভার।

এলাকটা প্রায় নির্জন। আশপাশে অনেক বাড়ি, তবে সবই অতি প্রাচীন। কায়রোর শহরতলিতে এরকম বাড়িই বেশি দেখা যায়। কেমন গা ছমছমে ভূতুড়ে একটা পরিবেশ। তামামা লাল বললেও, বাড়িটার রঙ ঠিক লাল নয়। ধুলো মাখা ইঁদুরের মত লাগছে বাড়িটাকে। লাল শুধু দরজা আর জানালাগুলো। তামামার কথায় বাড়িটার সামনে ট্যাক্সি থামাল ড্রাইভার।

দ্বিতীয় গাড়িটা, ট্যুরিং কার, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কারে পর্দা লাগানো, ফলে আরোহীদের কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না, শুধু ড্রাইভারের মাথা বাদে। তার মাথায় বিশাল একটা হ্যাট, মুখটা অন্য দিকে ফেরানো।

ট্যাক্সি থেকে নেমে তামামা বলল, 'নেমে এসো, ভেতরে যাই।'

হেসে উঠল ড্রাইভার। 'ভেতরে যাই, আর তুমি আমাকে ছুরি মেরে টাকা-পয়সা সব কেড়ে নাও!'

'তারমানে তুমি একটা ভয় পাওয়া ছাগল!'

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামল, যেন প্রমাণ করতে চায় সে ভীতু নয়। 'ভেতরে ঢুকলে আমার কি লাভ?'

'তোমাকে কাজ দেব বললাম না? সেই কাজের ব্যাপারে কথা

বলতে চাই।'

'ট্যাক্সির ভাড়া নিয়ে যে গোলমাল করে, সে আবার কি কাজ দেবে আমাকে?'

'কাজ আমি না, অন্য একজন দেবে,' বলল তামামা।

'অন্য একজন?'

'ঘুমোন নামটা শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল তামামা।

ড্রাইভারের চেহারা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। সে তার জোব্বার একটা প্রান্ত ধরে টান দিল, চোখের পলকে চকচকে একটা অটোমেটিক পিস্তল বেরিয়ে এল হাতে। পরমুহূর্তে সেটা জোব্বার আরেক জায়গায় অদৃশ্য হয়ে গেল। 'না, এই নাম আগে কখনও শুনিনি আমি,' বলল ড্রাইভার, যদিও মুখের হাসি বলে দেয় শুনেছে।

ড্রাইভারের কেরামতি দেখে সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল তামামা। 'সত্যি তোমাকে কাজের লোক বলে মনে হচ্ছে। চলো, ঘুমোনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। তোমার উপকারই হবে।'

'যেচে পড়ে অচেনা একজন লোকের উপকার করতে চাইছ? তারমানে নিশ্চয়ই তোমার কোন বদ মতলব আছে।'

'আরে বোকা, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই, এসো!' বলে দরজার দিকে এগোল তামামা। তার সঙ্গে ড্রাইভারও। তামামা মনে মনে ভারি খুশি। ড্রাইভার লোকটাকে সত্যি ওস্তাদ টইপের মনে হচ্ছে। জহুরী জহর চেনে।

দরজার গায়ে ছোট্ট একটা জানালা, সেটা খুলে বাইরে উঁকি দিল এক-কান-কাটা এক কিশোর। তার নাম খুদে বিচ্ছু, অন্তত তামামা এই নামেই ডাকল তাকে। বলল, 'তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দে, তা না হলে তোর আরেক কান কাটা যাবে।'

দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল ছেলেটা, হলুদ দাঁত বের

করে হাসছে। ওরা ভেতরে ঢোকার পর বলল, 'মনিব নেই।'

'ঘুমোন নেই?' হতাশ দেখাল তামামাকে।

'তামামা, আপনি একজন অচেনা মানুষের সামনে মনিবের নাম উচ্চারণ করলেন!' ছেলেটার গলায় অভিযোগ, চেহারায় ভয়।

কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল তামামা। ড্রাইভারের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কপাল খারাপ। বাজপাখি নীড়ে ফেরেননি, কাজেই তোমাকে কোন কাজ দেয়া যাচ্ছে না।'

'তুমি একটা গর্দভ!' রেগে উঠে বলল ড্রাইভার। 'শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করলে। তুমি ঘুমোন নামে কাউকে চেনোই না! আমাকে মিথ্যে কথা বলেছ।'

'ওরে আল্লাহ, কি বলে!'

ড্রাইভার বলল, 'সত্যি যদি ঘুমোনকে তুমি চেনো, আজ নিশ্চয়ই তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'কি আশ্চর্য, না চিনলে এখানে তোমাকে নিয়ে এলাম কেন! যদিও তার কাছে আমার গুরুত্ব খুব একটা বেশি নয়। হয়তো কাল বা পরশু দেখা হবে। তোমার সঙ্গে আমি পরে যোগাযোগ করব...'

এতক্ষণ আরবী বলছিল ড্রাইভার, এবার ইংরেজিতে বলল, 'অত সময় দেয়া যাবে না...'

আজ দ্বিতীয়বারের মত আক্রান্ত হলো তামামা। তার সরু গলাটা হঠাৎ এক হাতে চেপে ধরল ড্রাইভার।

এক-কান-কাটা কিশোর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ছেড়ে কলারের পিছন থেকে স্যাঁৎ করে ছুরি বের করল। ভঙ্গিটাই বলে দেয় কিভাবে সে তার কানটা হারিয়েছে। ড্রাইভারের বাম হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল, কিনারা দিয়ে আঘাত করল ছেলেটার গলায়। গুঙিয়ে উঠে পিছু হটল সে।

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠল তামামা। পা ও হাত, দুটো একসঙ্গে চালাল সে। বুট দিয়ে ড্রাইভারের পায়ের পাতার হাড় ভাঙার চেষ্টা করল, হাত দিয়ে খামচি দিল মুখে। ড্রাইভার মুখোশ পরে ছিল, সেটা খসে এল তামামার হাতে, চোখের কালো পট্টিটা সহ। ড্রাইভার, অর্থাৎ শহীদ, সময় মতই সরিয়ে নিয়েছে পা। তামামার ডান চোখে একটা জোরাল ঘুসি মারল ও। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল তামামা।

মাথাটা দু'একবার ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে কিশোর। ছুরি হাতে আবার হামলা করল। বয়েস কম হলে কি হবে, ছুরি চালাতে দক্ষ সে, নিশ্চয়ই কোন ওস্তাদ লোকের কাছে শিখেছে। বয়েস কম বলেই শহীদ তাকে আঘাত করতে চাইছে না। ওর উদ্দেশ্য ছেলেটাকে প্রথমে নিরস্ত্র করা, তারপর চড়-থাপ্পড় মেরে কথা বলানো। শক্ত কাঠের একটা চেয়ার দেখতে পেয়ে তুলে নিল সেটা। প্রতিপক্ষের হাতে ছুরি বা ওই ধরনের কিছু থাকলে আত্মরক্ষার সবচেয়ে ভাল হাতিয়ার চেয়ারই–সেজন্যেই সিংহকে যারা পোষ মানায় তাদের সঙ্গে সব সময় একটা চেয়ার থাকে।

ছুরি হাতে নাচতে শুরু করল কিশোর ছেলেটা। তবে শহীদকে ভয় পাচ্ছে সে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে, ফাঁক পেলেই পালাবে। নাচতে নাচতে একটা দরজার কাছে পৌঁছে গেল সে, তারপর ঘুরেই ছুটল। শহীদ চেয়ারটা ছুঁড়ল বটে, কিন্তু লাগল না।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ছেলেটা, একের পর এক কয়েকটা ঘর পার হলো, তারপর খিড়কি দরজা দিয়ে সোজা বাইরে। কিন্তু তার কপাল খারাপ। এখানে অপেক্ষা করছে রাসেল ও লীনা, সঙ্গে মহুয়াও।

'এই ছেলে, থামো!' ধমক দিল রাসেল।

তিনটে ধাপ টপকে গলিতে বেরুতে যাচ্ছিল ছেলেটা, পা পিছলে যাওয়ায় ধাক্কা খেলো পাশের দেয়ালে, তারপর খসে পড়ল

গলির মেঝেতে–সরাসরি হাতে ধরা ছুরির ফলায়। পাঁজর ভেদ করে বুকে ঢুকল ফলাটা, হৃৎপিণ্ডটাকে দু'ভাগ করে দিল।

ওরা তিনজন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল ছেলেটার দিকে। করুণ একটা দৃশ্য। সহ্য করার মত নয়। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে ছেলেটা। মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরই স্থির হয়ে গেল সে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে দেখল শহীদ। 'একি! কিভাবে ঘটল?'

'ও নিজেই পড়ে গেছে, ছুরিটা হাতে ছিল...' শুরু করল রাসেল।

'তোমরা কেউ ওকে ল্যাং মারোনি তো?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল শহীদ।

কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ওরা।

শহীদ জানতে চাইল, 'গাড়িটা কোথায়?'

রাসেল বলল, 'পাশের গলিতে। আপনার কথা মত মহুয়াদি গাড়ি নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিলেন। আপনার ট্যাক্সি দেখে ওটার পিছু নেন, তারপর রাস্তা থেকে তুলে নেন আমাদের দু'জনকে।'

মহুয়া জানতে চাইল, 'শহীদ, আমরা কি ঠিক জায়গায় পৌঁছেছি?'

শহীদকে চিন্তিত দেখাল। 'এখনও ঠিক বলতে পারছি না। তোমরা বাড়িটা সার্চ করো।' ভেতরে ঢুকল ও, ফিরে এল তামামার কাছে। এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি।

গোটা বাড়ি খুঁটিয়ে সার্চ করা হলো। কার্পেট তুলে দেখা হলো কোথাও কোন ট্র্যাপ-ডোর আছে কিনা, দেয়ালে বাড়ি মেরে পরীক্ষা করা হলো ভেতরটা ফাঁপা কিনা বোঝার জন্যে। শহীদের কাছে ফিরে এল ওরা। রাসেল রিপোর্ট করল, 'কেউ কোথাও নেই। আমরা কোন সূত্রও পাচ্ছি না।'

'তাহলে এই ব্যাটাই আমাদের একমাত্র ভরসা,' বলে হঠাৎ তামামাকে কষে একটা চড় মারল শহীদ।

জ্ঞান ফিরে পেলেও ভান করে পড়ে আছে তামামা, তবে ধরা পড়ে গেল চড়টা এড়াবার চেষ্টা করায়। তার বুকের ওপর একটা হাঁটু গাড়ল শহীদ, তারপর রাসেলকে বলল, 'সার্চ করো।'

তামামার মানি ব্যাগ বেশ কিছু মার্কিন ডলার আর স্থানীয় মুদ্রা পাওয়া গেল। কোন কাগজ-পত্র নেই।

'তোমরা চোর!' চিৎকার করছে তামামা।

হিস হিস করে শহীদ বলল, 'হ্যাঁ, চোর। তবে টাকা নয়, আমরা তোমার প্রাণ আর আত্মা চুরি করব।'

'অ্যাঁ! মানে?' হাঁ হয়ে গেল তামামা।

শহীদ বলল, 'আমরা কামাল আহমেদের বন্ধু।'

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি করছিল তামামা, কামালের নাম শুনে একেবারে স্থির হয়ে গেল।

'শহীদ,' বলল মহুয়া, 'আমরা ঠিক লোককেই ধরেছি। কামাল কোথায় জানে ও।'

প্রবলবেগে মাথা নাড়ল তামামা। 'এই নামের কাউকে আমি চিনি না! আল্লাহর কিরে!'

'ভাল চাও তো এখনও বলো কামাল কোথায়,' বলল শহীদ। 'তা না হলে এমন প্যাঁদানি দেব, বাপের নামও ভুলে যাবে।'

'কামাল কে?' বোকা সাজার ভান করল তামামা।

'তামামা, মিথ্যে কথা বলে কোন লাভ নেই,' বলল শহীদ। 'আমরা রিপোর্ট পেয়েই তোমার জন্যে ফাঁদ পেতেছিলাম। নিখোঁজ হবার আগে কামালকে তোমার সঙ্গে প্রতিদিন দেখা গেছে। এর একটাই অর্থ হতে পারে, কামাল তোমাকে গাইড হিসেবে ভাড়া করেছিল।'

'না, সত্যি বলছি...'

মহুয়া বলল, 'এভাবে কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করো, শহীদ।'

'তার আগে ওকে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হোক,' বলল লীনা।

'ট্রুথ সেরাম?' চোখ মিটমিট করে জিজ্ঞেস করল তামামা। 'আপনাদের সঙ্গে ট্রুথ সেরাম আছে?' এবার সত্যি ভয় লাগছে তার। ট্রুথ সেরাম ব্যবহার করা হলে গড় গড় করে সে তার সমস্ত অপরাধের কথা স্বীকার করে ফেলবে, নিজের অজান্তে।

হেসে উঠে শহীদ বলল, 'ট্রুথ সেরাম খুব দামী জিনিস। তোমার মুখ খোলাতে প্যাঁদানিই যথেষ্ট, ট্রুথ সেরাম লাগবে না। রাসেল, তামামার হাত-পা বেঁধে ফেলো, তারপর বেদম পেটাও। আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না।'

হাত তুলে ক্ষমাপ্রার্থনা ও আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল তামামা। 'দয়া করে মারবেন না। আমাকে একটু সময় দিন, যা যা জানি সব বলছি।'

শুরু করার পর গড় গড় করে সব বলে গেল সে।

দুই

আল্লাহকে সাক্ষী রাখল তামামা, মরা মায়ের কিরে খেলো, তারপর ঘোষণা করল সে মিথ্যে কথা বললে অবশ্যই দোজখের আগুনে

পুড়বে। হ্যাঁ, কামাল আহমেদ নামে একজন অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট কায়রোয় এসেছিলেন। কায়রোয় আসার পর আশ্চর্য একটা গল্প শোনেন তিনি। এ গল্প এক আত্মাকে নিয়ে। তবে এ আত্মা সাধারণ কোন মানুষের আত্মা নয়। ওঁরা কি ফারাও জুব্বাহ্ নেদ-এর নাম শুনেছেন? এই গল্পটা সেই ফারাও জুব্বাহ্ নেদ-এর আত্মাকে নিয়ে। ঠিক আছে, প্রথমে সে ফারাও নেদ সম্পর্কে ওঁদেরকে একটা ধারণা দিয়ে নিক।

অষ্টাদশ সাম্রাজ্যের আমলে এশীয় বীরদের মিশর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়। এই কাজটি যারা করেন তাঁরা 'মুক্তিদাতা' হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। ধারণা করা হয়, মুক্তিদাতাদের অন্যতম ছিলেন ফারাও জুব্বাহ্ নেদ। প্রথম তুতমোসিস-এর পরবর্তী শাসনকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। প্রথম তুতমোসিসই প্রথম ফারাও যিনি মিশরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র সিরিয়ায় নিয়ে যান। আবার অনেকের ধারণা, জুব্বাহ নেদই আসলে দ্বিতীয় তুতমোসিস ছিলেন। এ নিয়ে আর্কিওলজিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

'এ-সব তথ্য তুমি পেলে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লীনা।

'কোত্থেকে পেলাম মানে?' আহত দেখাল তামামাকে। 'আমি একজন শিক্ষিত মানুষ।'

'মিশরের কাকও কি ময়ূর সাজতে চায়?' হেসে উঠল মহুয়া। 'সত্যি কথা বলো, এ-সব তুমি কোত্থেকে জেনেছ?'

অগত্যা স্বীকার করতে হলো তামামাকে, 'কামাল সাহেবই আমাকে এ-সব বলেছেন।'

তাগাদা দিতে আবার গল্পটা শুরু করল সে। জুব্বাহ্ নেদ দ্বিতীয় তুতমোসিস হন বা না হন, শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। মিশরীয়রা আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি, সিরিয়া থেকে এনে তিনিই নাকি মিশরে ঘোড়া ব্যবহারের সূচনা ঘটান।

ঘোড়ার সঙ্গে চ্যারিয়টও প্রচলিত হয় তাঁর আমলে। অনেকের মতে, এ-সব কৃতিত্ব আসলে তৃতীয় তুতমোসিসের, মহান বিজয়ী হিসেবে যার খ্যাতি ছিল–তিনিই নাকি সিরিয়ান হিকসস-এর কাছ থেকে চ্যারিয়ট রহস্য জেনে নেন।

সে যাই হোক, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ফারাও জুব্বাহ নেদ-এর সমাধি নীল নদের আশপাশে বা দায়ির আল-বাহ্‌রি অথবা থিবেস-এর কোথাও পাওয়া যায়নি। আসলে মিশরের কোথাও ওটার কোন হদিশ মেলেনি। বলা হয়, 'অনেক দূর যাদুর এক দেশে' তাঁর সমাধি আছে।

অনেক দূর যাদুর এক দেশ বলতে কি বোঝায় কামাল তার ব্যাখ্যা দিয়েছে তামামাকে। প্রাচীন মিশরে অনেক দূর বলতে যা বোঝাত, আজকাল তাকে খুব কাছে বলে মনে করা যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–রানী হাতশেপ্‌সুত এক অভিযানে সোমালিল্যান্ডে গিয়েছিলেন। আধুনিক যুগে মিশর থেকে সোমালি খুব একটা দূরে নয়, অথচ মিশরীয় ইতিহাসে সহস্র বছর ধরে এই দূরত্বকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে। যাদুর দেশ প্রসঙ্গেও কথাটা সত্যি। এটার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। বারো থেকে আঠারোতম সাম্রাজ্যের সময়সীমার মধ্যে মিশরে তামা গলানো, লাশ মমি করা, বিশেষ ধরনের ওষুধ তৈরি ইত্যাদি শুরু হয়। এ-সব নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণা ছিল না। ফলে এগুলোকেই যাদুর কাজ বলে মনে করা হত।

শহীদ অধৈর্য হয়ে উঠল। 'তোমার বকবকানি শুনতে ভাল লাগছে না। এ-সব বাদ দিয়ে আসল কথায় এসো।'

তামামা গম্ভীর সুরে বলল, 'এ-সব বলছি যাতে কি ঘটেছে বুঝতে সুবিধে হয় আপনাদের।'

'হ্যাঁ, কি ঘটেছে?'

'ফারাও জুব্বাহ নেদ ছিলেন রহস্যময় এক ব্যক্তি। যাদুবিদ্যায়

তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বলা হত...'

'অনেক হয়েছে,' বাধা দিল শহীদ। 'এবার কামালের কথা বলো। সে কোথায়?'

'এই ফারাও নেদের আত্মা...'

দুম করে তামামার নাকে একটা ঘুসি মারল রাসেল। 'রাস্কেল! তোকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে শুধু সেই কথার জবাব দে!'

'প্রথমে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে...' রুমাল দিয়ে নাকের রক্ত মুছছে তামামা।

'কামাল কোথায়, তুই জানিস?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'জানি।'

'কোথায়?'

'সানহারারা নিয়ে গেছে তাকে। ফারাও-এর আত্মা...'

'এই আত্মা আর ভূত আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলছে,' বলল শহীদ। 'রাসেল, ব্যাটাকে আরও দু'চার ঘা লাগাও, তা না হলে আসল কথাটা বের করা যাবে না।'

বলতে যা দেরি, ঠাস করে এক চড় কষল রাসেল।

ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল তামামা।

কিন্তু চড়টা যত জোরেই লাগুক, তামামা এমন বিকট আওয়াজ করতে পারে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

তামামার আর্তচিৎকার শুনে মনে হলো ঘরের ছাদ ভেঙে পড়বে। হতভম্ব হয়ে পড়ল সবাই। এমন কি রাসেলকেও বিব্রত দেখাচ্ছে। হঠাৎ তামামার পিছন দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল লীনা, 'ভাবী, তুমি অমন করছ কেন?'

মহুয়া আহত পশুর মত আওয়াজ করছে, বাম হাতের আঙুলগুলো শূন্যে ঝাপটাচ্ছে। এখনও তামামার মাথার পিছনে-

দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'কিছু একটা কামড়েছে আমাকে!'

তামামার চোখ দুটো বিস্ফারিত, সাদা অংশের সবটুকু দেখতে পাচ্ছে ওরা, আতঙ্কে হাঁ করে আছে মুখ। তার এই অবস্থা দেখে শহীদও অবাক। হঠাৎ খেয়াল করল, তামামার কপালে ভেজা ভেজা হলুদ একটা দাগ।

এই হলুদ দাগ কোত্থেকে এল সেটা একটা রহস্য। এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। এই ছিল না, এই আছে। দাগটা কপালের ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে, চুল আর ভুরু থেকে সমান দূরত্বে। রঙের মতই জিনিসটা, আকারে বাংলাদেশী পঞ্চাশ পয়সার মত, তবে পুরোপুরি গোলাকার নয়।

কপালে কিছু একটা আছে, অনুভব করতে পারছে তামামা। আঙুল দিয়ে সেটা স্পর্শ করল সে। আঙুলটা চোখের সামনে এনে দেখল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দাগটা লেপ্টে গেছে কপালে।

আবার আর্তনাদ বেরিয়ে এল তামামার গলা থেকে। এবার শুধু ছাদ নয়, মনে হলো গোটা বাড়ি ভেঙে পড়বে।

ওদিকে মহুয়াও লাফাচ্ছে আর হাত ঝাপটাচ্ছে। 'জ্বালা করছে, শহীদ! আঙুলগুলো যেন পুড়ে যাচ্ছে!' বাম হাতটা তুলে মুখের সামনে আনল সে, ভাব দেখে মনে হলো আরাম পাবার আশায় আঙুলগুলো মুখে পুরবে।

শহীদ চেঁচিয়ে উঠল, 'না!' তামামাকে ছেড়ে সিধে হলো ও, খপ করে ধরে ফেলল মহুয়ার হাতটা।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর। সবাই সবার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কারও নিঃশ্বাসই নিয়মিত নয়। কামরায় যথেষ্ট আলো নেই যে পরস্পরের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাবে ওরা, আবার অন্ধকারও বলা চলে না। অনেকগুলো জানালা, তবে খোলা মাত্র একটাই। সেটার বাইরে চওড়া ও খোলা উঠান দেখা যাচ্ছে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মহুয়া। 'শহীদ, বিষাক্ত কিছু একটা কামড়েছে আমাকে!'

'ভূত!' চেঁচিয়ে উঠল তামামা। 'ফারাও নেদের ভূত!'

হঠাৎ তার কপালের দিকে চোখ পড়তে রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কপালে ওটা কি? হলুদ রঙ এল কোত্থেকে?'

'ফারাও নেদের ভূ...'

'চালাকি ছাড়ো!' ধমক দিল রাসেল। চার হাজার বছর আগেই ফারাওরা সবাই মারা গেছেন। এর মধ্যে তোমার কোন শয়তানি আছে...'

রাসেল হঠাৎ থেমে গেল। কারণ তামামা মারা যাচ্ছে।

ওদের কারও কল্পনায় ছিল না যে একজন মানুষের মৃত্যু এত যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। যন্ত্রণাটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না তামামা। শুধু চিৎকার করছে। কোন মানুষ এভাবে চিৎকার করতে পারে, না দেখলে ওরা বিশ্বাস করত না। গোটা ব্যাপারটা অবাস্তব মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে এর পিছনে অজানা কোন রহস্য আছে। বিকট একটা ভয়, রোমহর্ষক একটা আতঙ্ক আর সহ্য ক্ষমতার বাইরে একটা কষ্ট পাগল করে তুলছে তামামাকে। সে তার হাত দুটো সামনে তুলে কাকে যেন ঠেকাবার চেষ্টা করছে, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে। দেখে মনে হলো অন্ধ হয়ে গেছে, দিক সম্পর্কে হুঁশ নেই। একদিকে কাত হয়ে পড়ল সে, পড়ার সময় দেয়ালে ঠুকে গেল মাথাটা। মাথায় আঘাত পাওয়ায় চিৎকারটা থামল। মেঝেতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, গোঙাচ্ছে, মুখ থেকে অদৃশ্য কি যেন ছাড়াবার চেষ্টা করছে।

গোটা দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। তামামার চেহারায় রোমহর্ষক কি যেন একটা আছে।

'লোকটা মারা যাচ্ছে!' হাঁপিয়ে ওঠার মত আওয়াজ করল

রাসেল।

'পিছিয়ে এসো!' বলল শহীদ।

রাসেল শুনতে পায়নি। লাফ দিয়ে তামামার সামনে পড়ল সে, হাত বাড়াল তামামাকে ধরার জন্যে। পরক্ষণে ঝট করে টেনে নিল সেটা। 'উফ!' ব্যথায় কুঁচকে উঠল চোখ-মুখ। 'উফ!' লাফাচ্ছে চারদিকে, হাতটা ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন।

ডাঙায় তোলা মাছের মত আছাড় খাচ্ছে তামামার শরীর, মুখটা দুই হাত দিয়ে মোড়া।

রাসেল একবার নিজের হাতের দিকে তাকাচ্ছে, আরেকবার তামামার দিকে। 'শহীদ ভাই, এখানে কি ঘটছে বলুন তো!'

লীনা জানতে চাইল, 'রাসেল, তুমি কি কিছু ছুঁয়েছ?'

'কি জানি...কখন ছুঁলাম...উফ! সাংঘাতিক কষ্ট হচ্ছে!'

ঝট করে একটা চেয়ার তুলে নিল লীনা। কামরার চারদিকে হেঁটে বেড়াচ্ছে, সন্দেহ হলে গুঁতো মারছে বাতাসে।

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তামামা। মারা গেল সে।

কামরার ভেতর আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। বাতাসে আরও কিছুক্ষণ গুঁতো মারল লীনা, তারপর থামল, চেয়ারটা হাতে নিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। মহুয়া আর রাসেলও চুপ করে গেছে। শহীদ নড়ছে না, থমথম করছে ওর চেহারা।

ঠিক কি ঘটল তার কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সবাই। সম্ভবত সবার শিরদাঁড়াতেই ভয়ের একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে ভাব দেখা দিয়ে থাকবে।

শহীদ নিস্তব্ধতা ভাঙতে সবাই এমন চমকে উঠল, ঘরে যেন হঠাৎ কোন পটকা ফেটেছে। 'রাসেল, মহুয়া, লীনা–যাও, বাড়িটা আরেকবার ভাল করে সার্চ করো,' বলল শহীদ।

'কি খুঁজব আমরা?' জানতে চাইল রাসেল।

'বাড়ির ভেতর বা আশপাশে অস্বাভাবিক কিছু আছে,' সংক্ষেপে জবাব দিল শহীদ। ইঙ্গিতে সবাইকে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলল ও।

কামরায় একটাই দরজা। রাসেলের পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল মহুয়া আর লীনা। ওদের পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল শহীদ।

'শহীদ!' বন্ধ দরজার বাইরে থেকে ডাকল মহুয়া। 'তুমি বেরুবে না?'

'না। তোমরা তোমাদের কাজ করো, যাও।'

'তোমার ধারণা, ঘরের ভেতর তোমার সঙ্গে কিছু আছে?' তারপরও জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

'মহুয়া, আমাকে কাজ করতে দাও, প্লীজ। যাও, বাড়িটা সার্চ করো। আমাকে নিয়ে চিন্তা করো না।'

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল মহুয়া, কপালে চিন্তার রেখা।

'আরেকটা কথা,' বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বলল শহীদ। 'কিছু পেলে আমার কাছে ফিরে আসার দরকার নেই। নিজেরাই সামলাবে।'

মহুয়া বলল, 'আচ্ছা।'

ইতিমধ্যে রাসেল আর লীনা কাজ শুরু করে দিয়েছে, তাদের সঙ্গে এবার মহুয়াও যোগ দিল। তিনজন তিন দিকে সরে গিয়ে কাজটা করলে দ্রুত সারা যায়, কিন্তু প্রসঙ্গটা কেউ তুলল না। তিনজন একসঙ্গে থাকল ওরা।

'রাসেল,' লীনা বলল, 'তোমার হাতে কি হয়েছিল? তুমি কি কিছু ছুঁয়েছিলে?'

'কি জানি, কিছু ছুঁয়েছি কিনা বলতে পারব না।'

'কিন্তু তাহলে চেঁচিয়ে উঠলে কেন?'

'হাত বাড়াতেই ব্যথা পেলাম। উফ, সে কি সাংঘাতিক কষ্ট! ব্যাপারটা এক পলকের মধ্যে ঘটে গেল। হাতটা ঝট করে টেনে

নিলাম।'

লীনার চেহারায় ভয়ের ছায়া ফুটল। মহুয়ার দিকে তাকাল সে। 'ভাবী, তোমার কি হয়েছিল?'

'ওই প্রায় রাসেলের মতই।'

'কিন্তু তুমি বলছিলে জ্বালা করছে, ব্যথা করার কথা বলোনি।'

'ব্যথা করুক বা জ্বালা করুক, পার্থক্যটা কি?'

লীনা শান্ত গলায় বলল, 'পার্থক্য আছে বৈকি। কেউ তোমাকে ঘুসি মারলে তার ব্যথা এক রকম। কিন্তু কিছু যদি বেঁধে বা কামড় দেয়, তাতেও ব্যথা পাবে, তবে সেটা আরেক রকম–জ্বালা করবে, কটকট করবে বা শুলাবে। আরেক ধরনের ব্যথা হলো, যেন ইলেকট্রিক শক লাগল...'

মাথা নাড়ল মহুয়া। 'ঠিক কি রকম লেগেছে, বলা সম্ভব নয়। এমন চমকে উঠি আমি, এত ভয় পেয়ে যাই, আর কিছু খেয়াল করিনি–শুধু কষ্টটার কথা মনে আছে।'

'তোমরা কেউ তামামার কপালে হলুদ দাগটা খেয়াল করেছিলে?' জানতে চাইল লীনা।

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। সম্ভবত রঙ ছিল, অন্তত তরল কিছু। খানিকটা আঙুলে মেখে যায়।'

'কিন্তু জিনিসটা এল কোত্থেকে?' জানতে চাইল রাসেল।

এক ঘর থেকে আরেক ঘরে চলে আসছে ওরা, প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। কিছুক্ষণ আর কোন কথা হলো না। কেউই কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।

'কেউ আমরা কিছু দেখতে পেলাম না?' রাসেল নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'সবার চোখের সামনে ঘটল, অথচ কেউ কিছু বলতে পারছি না!' একটা জানালাকে পাশ কাটাচ্ছিল, হঠাৎ লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। 'এই, এদিকে!' ফিসফিস করল সে।

রাসেলের পাশে চলে এল ওরা, উঁকি দিয়ে নির্জন রাস্তায়

তাকাল। আবার ফিসফিস করল রাসেল, 'ওদিকে তাকান, মহুয়াদি–ওই যে, জোড়া বাড়ির মাঝখানের ফাঁকটায়। তাকিয়ে থাকো, লীনা।' বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা।

মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ, দেখেছি। ওখানে কেউ আছে। কিন্তু কি ব্যবহার করছে বলো তো? ছোট আয়না?'

'সম্ভবত আয়নাই,' বলল রাসেল। 'তবে লোকটা যে এই বাড়ির ওপর নজর রাখছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু দেখতে হয়।'

লীনা জানতে চাইল, 'লোকটাকে তুমি দেখেছ?'

'না,' বলে মাথা নাড়ল রাসেল। 'শুধু আলোর একটা ঝলক দেখলাম, আর কনুই পর্যন্ত কারও হাত।'

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে শহীদের সঙ্গে কথা বলল ওরা। বন্ধ ঘর থেকে এখনও বেরোয়নি ও। 'আমাদেরকে তোমার প্রয়োজন হবে, শহীদ?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

'না।'

'বাড়ির বাইরে, রাস্তায়, সন্দেজনক এক লোককে দেখেছি আমরা। একটু খোঁজ নিতে যাচ্ছি। ঠিক আছে তো?'

'যাও।'

মহুয়ার শুধু যে ভয় করছে তা নয়, শহীদের আচরণ রহস্যময়ও লাগছে। 'দরজা বন্ধ করে কি করছ তুমি বলো তো? লাশ ছাড়া আর কি আছে ওখানে?'

শহীদ জবাব দিল না, বলল, 'লোকটাকে পেলে ধরো, যাও।'

তিন

ছোট্ট একটা জাপানী পকেট-আয়না। হাত বাড়িয়ে ভাঙা একটা ইঁটের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখেছে লোকটা, ফলে আড়ালে থেকেও রাস্তার ওপারের বাড়িটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। রাস্তার ওপর পেট দিয়ে শুয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে, এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে আয়নার দিকে। চেহারায় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা।

লোকটার মাথায় মখমলের মত কালো চুল। পরনে দামী কাপড়ের স্যুট, নীল রঙের ডোরাকাটা; নেকটাইটা বিখ্যাত গুচি থেকে কেনা, জুতোও প্যারিস থেকে আমদানি করা। সুঠাম স্বাস্থ্য, দেখতেও অত্যন্ত সুদর্শন। সব মিলিয়ে পরিপাটি একটা ভাব। আভিজাত্যের ছোঁয়াটুকুও স্পষ্ট। হাত তুলে হ্যাটটা মাথায় ভাল করে বসিয়ে নিল সে। বয়েস এখনও ত্রিশ পেরোয়নি।

'যতদূর বুঝতে পারছি,' বলল সে, 'আমাদেরকে ওরা বেরিয়ে আসতে দেখেনি।'

'টাটা, এই পাড়াতে থাকাটাই আমাদের বোকামি হচ্ছে,' বলল মেয়েটা। ভয়ে হোক বা অন্য কোন কারণে, গলাটা কেঁপে গেল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' টাটা বলল। 'কি জানো, মনে হলো চিনি--অন্তত লোকগুলোকে হয় আগে কোথাও দেখেছি, নয়তো ওদের সম্পর্কে কোথাও কিছু শুনেছি। ব্যাপারটা জানা দরকার না, বাড়িটায় কেন ওরা ঢুকল?'

'কাউকে দেখলেই তাকে তোমার চেনা চেনা লাগে,'

অভিযোগের সুরে বলল মেয়েটা। 'বিশেষ করে কোন মেয়েকে যদি দেখো।'

'কি যে বলো না!' হেসে উঠল টাটা।

মেয়েটার চোখ দুটো নীলচে। মাথায় সোনালি চুল। ধূসর রঙের স্ল্যাকস পরেছে, গায়ে ব্রাউন রঙের সোয়েটার। তুষারধবল কোট আর হ্যাটটা হাতে। 'কাউকে দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না। একবার শুধু মনে হলো জানালার ভেতর কিছু একটা নড়ে উঠল। ব্যস।'

'টাটা, চলো এখান থেকে সরে যাই, প্লীজ!'

মাথা নাড়ল টাটা। 'দাঁড়াও, আরেকটু অপেক্ষা করি। ডোনা, লোকগুলোকে ভাল করে দেখেছ তুমি? তামামার সঙ্গে প্রথমে একজন ঢোকে, তাই না? বাকি তিনজন পিছন দিক দিয়ে, ঠিক?'

'হ্যাঁ, দেখেছি ওদের,' বলল মেয়েটা।

'চিনতে পেরেছ? মানে, আগে কখনও দেখেছ ওদের?'

মাথা নাড়ল ডোনা। খুবই নার্ভাস লাগছে তার। হাতের মুঠো বারবার খুলছে আর বন্ধ করছে।

'ডোনা, তুমি সম্ভবত কুয়াশার নাম শোনোনি, না?'

'না।' আবার মাথা নাড়ল ডোনা।

'তুমি আসলে আন্তর্জাতিক কোন খবরই রাখো না। এই কুয়াশা আশ্চর্য একটা চরিত্র। অসাধারণ একজন বিজ্ঞানী, অথচ কোন স্বীকৃতি নেই। পুলিস তাকে খুঁজে বেড়ায়। কেন? কারণ যেখানে তার নাক গলানোর কথা নয়, বা উচিত নয়, বিশেষ করে সেখানেই সে নাক গলাবে। আবার ব্যাংক ডাকাতিও নাকি করে।'

হাসি পেলেও হাসল না ডোনা। 'একজন বিজ্ঞানী? ব্যাংক ডাকাতি করে?'

'তা করুক, আমার কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই,' বলল

টাটা। 'তবে কথা হলো, সাধারণত এ-ধরনের রহস্য নিয়েও মাথা ঘামায় সে। বিচিত্র কোথাও কিছু ঘটলে হঠাৎ সেখানে উদয় হয়। আর ওই লোকগুলো, ওদের সঙ্গে তার কি যেন একটা সম্পর্ক আছে...'

'এখন মনে পড়ছে!' বলল ডোনা। 'ওই ভদ্রলোক, আর্কিওলজিস্ট...'

'হ্যাঁ, মি. কামাল আহমেদ। কুয়াশার নামটা কেউ একজন তার মুখে শুনেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কুয়াশার একটা দল আছে। বাড়িটার ভেতর এখন তারাই...'

'এরপর তুমি হয়তো বলবে যে তামামাই কুয়াশা, ছদ্মবেশ নিয়ে আছে।'

হেসে উঠল টাটা।

'ঠাট্টা নয়, টাটা,' বলল মেয়েটা। 'চলো এখান থেকে সরে যাই আমরা। সত্যি আমার খুব ভয় লাগছে।'

'হ্যাঁ, এখানে থাকাটা বোধহয় ভুলই হচ্ছে। তবে বাড়িটার ভেতর কুয়াশা আছে কিনা জানা গেলে ভাল হত। ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে।'

মেইন রোডে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সি নিল টাটা ও ডোনা। আরেকটা ট্যাক্সি নিয়ে ওদেরকে অনুসরণ করছে রাসেল, মহুয়া আর লীনা। আনোয়ার সাদাত এভিনিউ পিছনে ফেলে মাক্সি স্ট্রীটে পড়ল ট্যাক্সি, আতাবে প্রাসাদকে পাশ কাটিয়ে চলে এল এজবেকিয়া গার্ডেন এলাকায়, সেখান থেকে কায়রোর পশ্চিম উপকণ্ঠে। ট্যাক্সি বিদায় করে দিয়ে একটা বাড়িতে ঢুকল টাটা ও ডোনা। বাড়িটা উঁচু পাঁচিল দেয়া ঘেরা। এই বাড়িতে ওরা কেউ থাকে বলে মনে হলো না। নক করার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল দু'জন। দূর থেকে দেখা গেল না কে দরজা খুলল।

টাটা আর ডোনা বাড়ির ভেতর ঢোকার পর রাসেল বলল, 'আমি পিছন দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকি। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করবে তোমরা, লীনা। যদি দেখো আমি ফিরছি না, শহীদ ভাইকে খবর দেবে। তিনি আমার কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

'এটা ঠাট্টা করার সময় নয়, রাসেল,' ধমকের সুরে বলল মহুয়া। 'ভুলে যেয়ো না, কামালের কোন খবরই এখন পর্যন্ত পাইনি আমরা। তাছাড়া, তোমার শহীদ ভাইকে বিরক্ত করা যাবে না। সে বলে দিয়েছে যদি কোন সমস্যায় পড়ি, আমাদের নিজেদেরকেই তার সমাধান করতে হবে। তুমি না ফিরলে আমরা দু'জনও বাড়িটার ভেতর ঢুকব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাসেল বলল, 'দুঃখিত, মহুয়াদি। আমি যাবার আগে আপনারা ব্যাগ খুলে পিস্তল দুটো চেক করে নিন।'

মহুয়া আর লীনা ওদের পিস্তল পরীক্ষা করল। 'সব ঠিক আছে,' বলল মহুয়া।

'মহুয়াদি, আপনার হাত কেমন আছে?' রওনা হবার আগে জিজ্ঞেস করল রাসেল। 'দেখি তো।'

হাতটা দেখাল মহুয়া। লালচে হয়ে আছে, যেন হালকাভাবে আগুনের শিখা বোলানো হয়েছে চামড়ার ওপর, অথচ লোমগুলো পোড়েনি। 'এখন আর কোন ব্যথা-ট্যথা নেই,' বলল মহুয়া।

'পনেরো মিনিট,' বলে রাস্তা পার হলো রাসেল, একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'মিনিট পর মহুয়ার একটা হাত চেপে ধরল লীনা। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'রাসেলের কাণ্ড দেখেছ!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ও তো আরবীর কিছুই বোঝে না!'

'তাই তো!' বলে হেসে ফেলল মহুয়া।

'ভাবী, তুমি হাসছ?'

'হাসছি রাসেলের চালাকির কথা ভেবে,' বলল মহুয়া। 'আমরা মেয়ে তো, তাই চায়নি ঝুঁকি নিয়ে ওর সঙ্গে আমরাও বাড়িটায় ঢুকি। কেমন তাড়াহুড়ো করে চলে গেল দেখলে না!'

'কিন্তু ওর ফিরতে দেরি হলে আমাদেরকে তো ভেতরে ঢুকতেই হবে, তাই না?'

মহুয়া কিছু বলল না।

ওদিকে রাসেল কোন সময় নষ্ট করছে না, কারণ জানে যে-কোন মুহূর্তে ওদের মনে পড়ে যাবে যে সে আরবী জানে না। মনে পড়লেই ছুটে আসবে ওরা, অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে বাড়িটায় ঢুকতে বাধা দেবে তাকে। সত্যিই তো, একজন মিশরীয় নাগরিকের বাড়িতে ঢুকে কি লাভ, তার বা তাদের কথা যদি সে বুঝতেই না পারে? আপাতত লাভ-লোকসানের কথা রাসেল ভাবছে না। এই মুহূর্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়েছে তাকে। এক লোক, সঙ্গিনীকে নিয়ে, আয়নার সাহায্যে ওদের ওপর নজর রাখছিল। কাজেই তাদের উদ্দেশ্য কি জানতে হবে তাকে। বাড়িটায় কোন রহস্য আছে কিনা বোঝার জন্যে ভাষা জানাটা জরুরী নয়। লোকটার, তার সঙ্গিনীর, এবং বাড়ির মালিকের আচরণ আড়াল থেকে দেখে ওদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করবে সে।

বাড়িটা বেশ পুরানো। কায়রোর বেশিরভাগ পুরানো বাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো, মাঝখানে চৌকো একটা উঠান থাকে, এটারও আছে। বেশ বড় বাড়ি, নিচের অংশটা পাথর দিয়ে তৈরি, সেই পাথর আনা হয়েছে সংলগ্ন পাহাড় থেকে। ওপরের অংশ তোলা হয়েছে ইঁট গেঁথে, তারপর রঙ করা হয়েছে। সময় নষ্ট না করে পাঁচিলের মাথায় উঠল রাসেল, সেখান থেকে একটা খেজুর গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল, তারপর সরু কার্নিস ধরে খানিকটা এগিয়ে পানির পাইপ বেয়ে উঠে পড়ল তিনতলার একটা ঝুল-বারান্দায়।

ঝুল-বারান্দায় দরজা, দরজার পাশে জানালা আছে। জানালায় পর্দা আধ ইঞ্চি সরিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল রাসেল। বেশ বড় একটা কামরা, হলরুমের মত। মেঝেতে দামী কার্পেট, সিলিং থেকে ঝুলছে ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি। দেখে মনে হলো জলসাঘর। ভেতরে কোন লোকজন নেই।

দরজাটা খোলাই পেল রাসেল। ভেতরে ঢুকল পা টিপে টিপে। নাক বরাবর সামনে একটা খোলা জানালা। সেটার সামনে দাঁড়িয়ে উঠানের ওপর চোখ বোলাল। উঠানের মাঝখানে একটা ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে। ফোয়ারার চারপাশে উঁচু বেদি, লোকজন বসে বিশ্রাম নিতে পারে বা গল্প করতে পারে। রাসেল তাকিয়ে আছে, এই সময় সেই লোকটা তার সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এল উঠানে। ওদের সঙ্গে আরও একজন লোক রয়েছে, হাতে একটা ট্রে। লোকটা খুবই মোটা। চেহারায় কেমন যেন একটা শয়তানি বা অশুভ ভাব। বয়েস হবে, রাসেল আন্দাজ করল, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

ফোয়ারা থেকে খানিকটা দূরে একটা মেটাল টেবিল ফেলা আছে, চারপাশে কয়েকটা চেয়ার, ওপরে ডোরাকাটা কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙানো। সেই চাঁদোয়ার নিচে এসে বসল তিনজন। মোটা লোকটা টেবিলে ট্রে নামাল, ইংরেজিতে বলল, 'বরফ দেয়া হুইস্কি, পেটে পড়লে একটা অশান্ত গরিলাও শান্ত হবে।' খিক খিক করে হাসল লোকটা।

মেয়েটা চুমুক দিল গ্লাসে। 'ওহ্, গড্! এ তো দেখছি তরল আগুন, স্রেফ খুন করে ফেলবে!'

ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে রাসেল। ইংরেজিতেই কথা বলছে, ফলে বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। মোটা লোকটা আবার হেসে উঠল। আঙুলে পানি নিয়ে টেবিলের ওপর নকশা আঁকছে সে। কোন কারণ নেই, অযথা হঠাৎ হঠাৎ হেসে উঠছে

বেসুরো গলায়।

'তুমি থামবে, জেফরি?' খেপে উঠল মেয়েটার সঙ্গী। 'এরকম সিরিয়াস একটা ব্যাপার, অথচ তোমার হাসি পাচ্ছে?'

জেফরি গম্ভীর হলো। 'দুঃখিত। এটা আসলে আমার একটা নার্ভাস হ্যাবিট–খিক খিক করা। তবে এটা আমার হাসি নয়। খুব বেশি ভয় পেলে এরকম বিচ্ছিরি একটা আওয়াজ বেরোয় গলা থেকে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল।

তারপর জেফরি জিজ্ঞেস করল, 'তামামা তাহলে মারা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর সবাই যেভাবে মারা গেছে, সেভাবেই?'

'হ্যাঁ। দায়ী ওই সেই ফারাও নেদের আত্মা।'

'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো ওরকম কিছু একটা আছে?' জানতে চাইল জেফরি।

'আ-আমি জানি না।'

'ঘটনাটা তুমি ঘটতে দেখেছ, নিজের চোখে?'

'না, ঠিক তা দেখিনি। তবে আমি জানি মি. কামাল যখন নিখোঁজ হন তখন কায়রোতেই ছিলেন মি. কুয়াশা। আমি এ-ও জানি যে বাংলাদেশ থেকে মি. কুয়াশার একটা দল কায়রোয় পৌঁছেছে। হয় ছদ্মবেশী মি. কুয়াশা, নয়তো তার দলের কোন লীডার তামামাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িটায় ঢোকে। বাড়ির চাকর ছেলেটা মারা গেছে দুর্ঘটনায়। মি. কুয়াশার দলের আরও তিনজন বাড়িটার পিছন দিকে ছিল। তারাও বাড়ির ভেতর ঢোকে। কিছুক্ষণ পর তামামার চিৎকার শুনতে পাই আমি। ওদের কথাবার্তাও কানে আসে। সত্যি কথা বলতে কি, নিজের চোখে কিছুই আমি দেখিনি। শুধু শুনেছি।'

নার্ভাস্ ভঙ্গিতে হাতের গ্লাসটা নাড়াচাড়া করছে মোটা জেফরি। আপনমনে মাথা নাড়ল সে, তারপর বলল, 'মি. কুয়াশা যে কায়রোয়, তা আমিও জানি। তবে তাঁর কোন দলটল নেই। মি. কামাল নিখোঁজ হবার পর বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন তাদের লীডার হলেন শহীদ খান নামে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমি যত দূর জানি, মি. কুয়াশার সঙ্গে মি. শহীদের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সে যাই হোক, মি. কুয়াশার সঙ্গে আমি দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই রহস্যময় মৃত্যু সম্পর্কে তাঁকে জানানো। আমার বিশ্বাস, তিনি এই রহস্যের মীমাংসা করতে পারবেন। কিন্তু মি. কুয়াশা নিজের গবেষণায় এত ব্যস্ত যে আমাকে সময় দিতে পারেননি। তবে জানিয়েছেন, এই অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে তিনি সচেতন, কিছু একটা করবেন বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। আমার ধারণা, টাটা, বাড়িটায় তুমি মি. কুয়াশাকে দেখোনি। দেখেছ মি. শহীদকে।'

জেফরি থামতে নিস্তব্ধতা নেমে এল উঠানে। তিনতলার জানালা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে রাসেল। ভয়ে আর উত্তেজনায় তিনজনকেই দিশেহারা লাগছে তার।

টাটা সামনের দিকে ঝুঁকল। 'জেফরি, এ-কথা কখনও মনে হয়েছে তোমার যে তুমিও খুন হয়ে যেতে পারো?'

রাসেল তাকিয়ে ছিল বলেই পরিষ্কার দেখতে পেল, জেফরির মুখে হলুদ কি যেন একটা আঘাত করল। হঠাৎ যেন হলুদ রঙের ছিটা লাগল জেফরির মুখে–নাকের পাশে, কপালে নয়।

মেয়েটা আঁতকে উঠল।

মুখে হাত দিল জেফরি, চোখের সামনে হাতটা এনে দেখছে কি লাগল মুখে। তার চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক ফুটে উঠল। অকস্মাৎ টাটাকে লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল সে, কিন্তু লাগাতে পারল না। চিৎকার করে বলল, 'জাহান্নামে যাও! তোমার পিছু নিয়ে এখানে

চলে এসেছে ওটা!'

চেয়ার ছেড়ে পিছিয়ে এল টাটা। 'দৌড়াও!' বলল সে। 'পালাও!'

চেয়ার থেকে পড়ে গেল জেফরি। অসম্ভব মোটা হওয়া সত্ত্বেও লাফ দিয়ে সিধে হলো, তারপর ছুটল একটা দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। দমাদম ঘুসি মারল কবাটে। খুলছে না দেখে আরেক দরজার দিকে ছুটল। আশ্চর্য, এটাও বন্ধ।

উঠানে বেরুবার দরজা মাত্র তিনটে। শেষ দরজায় এসেও বাধা পেল জেফরি। একটা ঝুল-বারান্দার আড়ালে ওটা, তাই তিনতলার জানালা থেকে রাসেল দেখতে পাচ্ছে না।

জেফরির আর্তচিৎকার শুনতে পেল সে। কি ঘটছে দেখার জন্যে জানালার বাইরে মাথা আর গলা বের করল।

জেফরি শুয়ে পড়েছে। উঠানের পাকা মেঝেতে অদৃশ্য কার সঙ্গে যেন ধস্তাধস্তি করছে। ঝুল-বারান্দার নিচেটা অন্ধকার না হলেও, আলো খুব কম। রাসেলের সন্দেহ হলো, হালকা কোন পদার্থ জেফরিকে যেন ঘিরে রেখেছে। পদার্থ, নাকি ছায়া, সঠিক বোঝা গেল না।

জেফরির হাত-পা ছোঁড়া ক্রমশ লক্ষ্যহীন, এলোমেলো হয়ে উঠল। প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

জানালায় গ্রিল বা গরাদ নেই, রাসেল সিদ্ধান্ত নিল বাইরে বেরিয়ে উঠানে নামবে সে। জানালার নিচে সরু কার্নিস, সেখান থেকে পাইপ বেয়ে খানিকটা নামল, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল উঠানে।

চমকে উঠে পিছু হটল মেয়েটা।

ঝট করে হিপ পকেটে হাত ভরল টাটা। হাতটা পকেটে থাকতেই লোহার মত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল রাসেল। কিছুক্ষণ

ধস্তাধস্তি করল ওরা। টাটার হিপ পকেটে হাত ভরল রাসেল, ভেতর থেকে তুলে আনল একটা পিস্তল। অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে লাফ দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল টাটা, কিন্তু রাসেল খপ করে তার ঘাড়টা ধরে ফেলল, তারপর কনুইয়ের ভাঁজে পেঁচাল গলাটা।

সাদা কোট হাতড়ে একটা পিস্তল বের করল মেয়েটা। 'ছেড়ে দাও ওকে!'

কনুই আর হাঁটু চালিয়ে রাসেলকে কাবু করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে টাটা।

'কি আশ্চর্য!' বলল রাসেল। 'বুঝতে পারছ না, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি!' টাটার গলায় হাতের প্যাঁচ আরও কষল সে, ফলে টাটার জিভ বেরিয়ে এল।

পিস্তলটা নেড়ে মেয়েটা আবার বলল, 'ছেড়ে দাও ওকে!' আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সে, গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না।

টাটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছে রাসেল। হেসে উঠল সে। 'শান্ত হও, মাথা ঠাণ্ডা করো। গুলি করার আগে বুঝতে চেষ্টা করো কাকে গুলি করছ। তোমরা লোক ভাল হলে আমি তোমাদের শত্রু নই।'

মেয়েটা দ্বিধায় পড়ে গেল।

রাসেল গলা চড়িয়ে ডাক দিল, 'মহুয়াদি, লীনা–আমার সাহায্য দরকার!'

স্থির হয়ে গেছে জেফরি। তার শরীর এমন একটা আকৃতি পেয়েছে, কোন জীবিত মানুষ এরকম আকৃতি পেতে পারে না। দেখে মনে হচ্ছে তার শরীরে কোন হাড় নেই।

বাড়ির সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ব্যর্থ হলো মহুয়া আর

লীনা, কারণ সেটায় ভেতর থেকে তালা দেয়া। অবশেষে পাঁচিল টপকেই উঠানে নামতে হলো ওদেরকে।

ওরা যখন পাঁচিল টপকাচ্ছে, টাটার আরেক পকেট থেকে একটা ছুরি বের করল রাসেল। ছুরিটার হাতল আইভরির তৈরি, সোনার পাত দিয়ে মোড়া, অলঙ্কার হিসেবে লাল দুটো মূল্যবান পাথরও আছে।

টাটার পিস্তলটাও তাই–হাতলে সোনা, আইভরি আর দামী পাথর বসানো।

মহুয়া আর লীনা এগিয়ে আসছে, ইঙ্গিতে জেফরিকে দেখিয়ে রাসেল বলল, 'দেখো কিভাবে মারা গেছে! অবশ্য এখনও আমি জানি না সত্যি মারা গেছে কিনা।'

'কি হয়েছিল?' জানতে চাইল লীনা।

'বলা কঠিন,' বলল রাসেল। 'তবে হলুদ কিছু একটা লেগেছিল মুখে। একটা ছায়ার মত দেখেছি, লোকটাকে ঘিরে ছিল–তবে নিশ্চিত নই, চোখের ভুলও হতে পারে। তামামা যেভাবে মারা গেছে, ঠিক সেভাবেই মারা গেছে লোকটা।'

'কখন?' জানতে চাইল মহুয়া।

'এই তো, এইমাত্র। আমার চোখের সামনে।'

'চোখের সামনেই যদি মারা গেল, তুমি দেখোনি কি কারণে মারা গেল?' জেরা করার সুরে জিজ্ঞেস করল লীনা।

'তামামাও তো আমাদের চোখের সামনে মারা গেল, তাই না? কেউ বুঝতে পেরেছি, কে তাকে মারল? প্রশ্ন হলো, লোকটা কি সত্যি মারা গেছে?'

ভয়ে ভয়ে জেফরির দিকে দু'পা এগোল মহুয়া। খুব কাছ থেকে দেখছে তাকে, তবে স্পর্শ করছে না। 'কোন সন্দেহ নেই যে মারা গেছে,' বলল সে। 'ছুঁতে ভয় লাগছে!'

লীনা সাবধান করে দিল, 'ভাবী, সরে এসো!'

রাসেল বলল, 'মহুয়াদি, দেখুন তো দরজাগুলো খোলা যায় কিনা।'

মহুয়া আর লীনা এক এক করে তিনটে দরজাই পরীক্ষা করল। সবগুলো ভেতর থেকে বন্ধ।

মেয়েটা, ডোনা, তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'কিন্তু তা কি করে হয়! আমরা যে দরজা দিয়ে উঠানে এলাম, ওটা তো খোলাই ছিল!'

'কিন্তু এখন বন্ধ,' বলল মহুয়া।

উঠানের পাকা মেঝেতে বসে ব্যথায় কাতরাচ্ছে টাটা। ঘাড় ডলছে, হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছে, কোট থেকে ধুলো ঝাড়ছে। হঠাৎ একটা হাত তুলে কি যেন দেখাবার চেষ্টা করল সে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সবাই। জেফরির পিছনে একটা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে টাটা। বলল, 'কি বলছেন আপনারা! ওই দরজাটা তো খোলাই রয়েছে!'

'কি সাংঘাতিক!' মহুয়া হাঁ হয়ে গেল।

লীনা ছুটল, এক মুহূর্ত পর মহুয়াও তার পিছু নিল। কোন সন্দেহ নেই, দরজাটা সত্যি খোলা। অথচ এক মিনিটও হয়নি পরীক্ষা করে গেছে ওরা, তখন বন্ধ ছিল। গলা চড়িয়ে রাসেলকে লীনা বলল, 'একটু আগে এটা বন্ধই ছিল! কিন্তু আমরা পরীক্ষা করার পর কেউ ভেতর থেকে খুলে দিয়েছে, কবাটও ফাঁক করে রেখে গেছে।'

রাসেলও গলা চড়িয়ে বলল, 'খুঁজে দেখো বাড়ির ভেতর কে আছে।'

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল লীনা আর মহুয়া। গোটা বাড়ি সার্চ করল ওরা। প্রথমবার দ্রুত, দ্বিতীয়বার ধীরে-সুস্থে। কিন্তু কাউকে পাওয়া গেল না। উঠানে ফিরে এল ওরা, দেখল লাশটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাসেল।

'জিনিসটা বাতাসে মিলিয়ে গেছে,' বলল রাসেল।

'কি মিলিয়ে গেছে বাতাসে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল লীনা।

'লোকটার মুখে সেই হলুদ দাগটা ছিল,' বলল রাসেল। 'জিনিসটা মুখে লাগাতেই মারা গেছে সে। এখন মুখে সেই দাগ নেই, মিলিয়ে গেছে।'

চার

সুদর্শন টাটা দম ও আত্মমর্যাদা খানিকটা ফিরে পেয়েছে। স্যুটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সিধে হলো সে, রাসেলকে বলল, 'পিস্তলটা সাবধানে নাড়াচাড়া করুন, প্লীজ। ওটার ট্রিগার অত্যন্ত স্পর্শকাতর।'

পিস্তলটা খুঁটিয়ে দেখছে রাসেল। 'এতে যে সোনার পাত রয়েছে তা কি আসল?'

'অবশ্যই,' জবাব দিল টাটা। 'আর লাল পাথরগুলো খাঁটি রুবি।'

রাসেল কোন মন্তব্য করছে না দেখে টাটা আবার বলল, 'পিস্তলটার দাম দশ হাজার মার্কিন ডলার।'

'আর এটা?' পাথর বসানো ছুরিটা দেখাল রাসেল।

'ওটা তো একটা অ্যান্টিক পীস। প্রিন্স অভ কালাব্রিয়াকে, অর্থাৎ আমার গ্রেট-গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ডফাদারকে উপহার দিয়েছিলেন

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। আমাদের পরিবারে ওটা অমূল্য সম্পদ। একজন ডিলারের কাছে দাম পাওয়া যাবে বিশ বা তারও বেশি মার্কিন ডলার।'

মন দিয়ে ওদের কথা শুনছে মহুয়া, ডান হাত দিয়ে বাম হাতের আঙুল মটকাচ্ছে। জানতে চাইল, 'তোমাদের পারিবারিক পদবী কি ইব্রাহিম?'

মহুয়ার উদ্দেশে মাথা নত করল টাটা। 'এবরাহাম, জ্বী। আমি কাউন্ট কারডুসি কাপুয়ানা জিয়াপেট্রিও লিওনার্দোনিয়া হোসেফিনি টাটাগ্লিয়া এবরাহাম। সংক্ষেপে, টাটা।'

'মহুয়াদি,' অবাক হয়ে জানতে চাইল রাসেল, 'আপনি ওকে চেনেন?'

'ইটালির অত্যন্ত প্রভাবশালী এক পরিবারের সদস্য টাটা,' বলল মহুয়া। 'মাফিয়াদের সঙ্গে কয়েক প্রজন্ম ধরে লড়াই করছে।'

'তুমি যদি ইটালিয়ান কাউন্ট হও, কায়রোয় কি করছ?' টাটাকে প্রশ্ন করল রাসেল।

'আরে ভাই, আর বোলো না।' মাথা নেড়ে হতাশ একটা ভঙ্গি করল টাটা। 'মাফিয়ারা তাড়া করায় দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি আমি। মিশরে থাকছি, আর জন্মভূমির শোকে কাতর হচ্ছি।'

ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখাল রাসেল। 'এ কাউন্টিস?'

'হলে তো ভালই হত।' খেদ প্রকাশ পেল টাটার উচ্চারণে। 'হবার জন্যে প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছি, জানি না গ্রহণ করা হবে কিনা।'

মেয়েটা কাউন্টিস না হওয়ায় মনে মনে খুশি হলো রাসেল। টাটাকে তার পছন্দ হচ্ছে না। বড় বেশি পিচ্ছিল, চতুর আর মেকি মনে হচ্ছে ছোকরাকে। 'তুমি তোমার পরিচয় দেবে?' মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি ডোনা মিলার,' বলল মেয়েটি।

'আমেরিকান?'

'হলে ভালই হত,' বলল ডোনা। 'আমি আসলে আইরিশ। বাবা আইরিশ ছিলেন, তবে তিনি মিশরীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় তাঁর মত আমিও মিশরীয়।'

রাসেল বলল, 'তোমার সম্পর্কে আরও তথ্য পেলে খুশি হই।'

মহুয়া টিপ্পনি কেটে বলল, 'এই যেমন টেলিফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি–কি বলো?'

রাসেলকে বিব্রত দেখাল। তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল লীনা। 'ভাবী তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, রাসেল।'

ডোনা বলল, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে কি ভাষায় কথা বলছ?'

মহুয়া বলল, 'বাংলায়।'

'ইংরেজিতে বলো, তোমাদের কথা আমিও বুঝতে চাই।' রাসেলের দিকে ফিরল ডোনা। 'তোমার নাম কি?'

'রাসেল...'

'রাসেল, তোমার সম্পর্কেও সব কথা জানতে ইচ্ছে করছে আমার,' বলল ডোনা, তার চোখে কৌতুক ও কৌতূহল ঝিক করে উঠল।

'নিজের কথা বলতে ও খুব লজ্জা পায়,' বলল মহুয়া। 'আমি বলছি, ইচ্ছে হলে নোট রাখতে পারো। বাংলাদেশে ওর চারটে বউ আছে, সব মিলিয়ে ছেলেমেয়ের সংখ্যা সতেরো–রাসেল, সতেরো নাকি আঠারো?'

খিলখিল করে হেসে উঠল লীনা। তারপর বলল, 'ইস, ভাবী, তুমি এভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙলে! রাসেল না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে!'

'ওরা ঠাট্টা করছে,' বলে ডোনার দিকে ঘুরে লালচে চেহারাটা লুকাল রাসেল।

ডোনা বলল, 'কায়রোয় এক সময় কার্পেটের খুব বড় ব্যবসা ছিল আমাদের। বাবা-মা মারা গেলেন প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে। প্রচুর টাকা রেখে গিয়েছিলেন, বাজে খরচ করে প্রায় সব শেষ করে

ফেলেছি। তেমন কোন যোগ্যতা নেই আমার, আর হয়তো ছ'মাস পর স্টেনোগ্রাফারের চাকরি খুঁজতে হবে।'

টাটা গম্ভীর সুরে বলল, 'এভাবে কথা বলো না, ডোনা। তুমি ভাল করেই জানো, আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে।'

নিজের পরিচয় ব্যাখ্যা করল রাসেল, প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খানের শিষ্য; তারপর মহুয়া ও লীনার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। কামাল প্রসঙ্গেও কয়েকটা কথা বলল। শহীদ খানের সহকারী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পেশায় গোয়েন্দা হলেও, অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট। আমেরিকা থেকে কায়রোয় আসার পর নিখোঁজ হয়ে গেছে। তার আমন্ত্রণেই কায়রোয় বেড়াতে এসেছে ওরা, এসে জানতে পেরেছে নিখোঁজ হবার আগে তামামা নামে এক লোকের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত কামাল। সেজন্যেই তামামাকে ধরা হয়। কিন্তু সে মারা গেছে। কিভাবে মারা গেছে তা তো তারা জানেই। তাদেরকে বাড়িটার আশপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে ওরা, তাই পিছু নিয়ে এখানে এসেছে।

একটু থেমে টাটা আর ডোনার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাসেল। 'তোমাদেরকেই এখন প্রমাণ করতে হবে যে তামামার মৃত্যুর জন্যে তোমরা দায়ী নও। শুধু তামামা নয়, আমার তো সন্দেহ জেফরিকেও তোমরা খুন করেছ।'

'হোয়াট!' বিস্ফোরিত হলো টাটা। 'তোমার ধারণা, আমরা তামামা আর জেফরিকে খুন করেছি?'

'হ্যাঁ।'

টাটা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'গুড গড! এমন অদ্ভুত কথা জীবনেও শুনিনি!'

'অবাক হবার ভান করে কোন লাভ নেই,' বলল রাসেল। 'যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করো ওদের মৃত্যুর জন্যে তোমরা দায়ী নও।'

ইতস্তত করতে দেখা গেল টাটাকে। 'আ-আমি কি ডোনার

সঙ্গে আলাপ করতে পারি?'

কাঁধ ঝাঁকাল রাসেল। 'কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে!'

'মানে, নিভৃতে আর কি।'

মহুয়া আর লীনার দিকে তাকাল রাসেল। ওরা মাথা ঝাঁকাল 'যাও,' টাটাকে বলল সে, 'ওই ফোয়ারার কাছে গিয়ে আলাপ করো।'

'ধন্যবাদ,' বলে ডোনার দিকে ফিরল টাটা। 'এসো, ডোনা।'

ফোয়ারার কাছে সরে গিয়ে চাপা স্বরে দ্রুত কথা বলছে ওরা। কি বলছে শোনা যাচ্ছে না। এক সময় সায় দেয়ার ভঙ্গিতে দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল, তারপর ফিরে এল আগের জায়গায়। টাটা বলল, 'ডোনাও আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলছে, তোমরা আমাদের বন্ধু। কাজেই আমরা যা জানি সবই তোমাদেরকে বলা দরকার।'

'ভাল কথা। বলে ফেলো,' তাগাদা দিল রাসেল।

মহুয়া বলল, 'এক মিনিট। তামামা যে-বাড়িতে খুন হলো, ওখানে কি টেলিফোন আছে?'

টেলিফোন আছে কি-না কেউ জানে না।

'আমি দেখে আসি,' বলে বাড়ির ভেতর ঢুকল রাসেল। কয়েক মিনিট পর থমথমে চেহারা নিয়ে ফিরে এল সে। 'ওই বাড়িতে ফোন আছে, কিন্তু শহীদ ভাই রিসিভার তুলছেন না। ভাবছি তাঁর কোন বিপদই হলো কিনা।'

'ঠিক আছে, আগে এদের বক্তব্য শোনা যাক,' বলল মহুয়া। 'তারপর খোঁজ নেয়া যাবে।'

জেফরিকে বন্ধু বলে দাবি করল টাটা আর ডোনা। দিন কয়েক আগে থেকেই তারা খেয়াল করছিল, কি একটা অজানা ভয়ে কুঁকড়ে আছে জেফরি।

জেফরি আসলে টাটার নয়, মিলার পরিবারের বন্ধু ছিল। ডোনার বাবার কার্পেটের ব্যবসা সেই কিনে নেয়। ডোনার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে টাটার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয় জেফরির। তিনজন মিলে গলফ খেলত, টেনিস খেলত, নাইট ক্লাবে যেত আড্ডা দিতে।

জেফরি কেন বা কাকে ভয় পাচ্ছে তা কোন দিন বলেনি ওদেরকে। প্রশ্ন করা হলে হয় সে এড়িয়ে গেছে, নয়তো অসংলগ্ন এমন সব কথা বলেছে যার কোন অর্থ হয় না। তবে পরে, গতকাল, ওদেরকে সব কথা খুলে বলে সে।

জেফরি ভয় পাচ্ছিল তামামাকে। কারণ তামামা তার সঙ্গে দেখা করে জানায়, বিশ হাজার মার্কিন ডলার চাই তার। টাকাটা না দিলে ফারাও জুব্বাহ্ নেদের আত্মা নাকি খুন করবে জেফরিকে।

ফারাও জুব্বাহ্ নেদের ভূত, আত্মা বা অভিশাপ সম্পর্কে আগেই নানা রকম গুজব শুনেছিল জেফরি। ব্যাপারটা সে বিশ্বাস করেনি, আবার অবিশ্বাসও করেনি। কিন্তু তামামার কথা শুনে স্বভাবতই ভয় পায় সে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারে, কায়রোয় অনেক লোক খুন হয়েছে, পুলিস একটা খুনেরও কিনারা করতে পারেনি। সবার ধারণা, এই খুনগুলোর পিছনে দায়ী জুব্বাহ্ নেদের আত্মা বা অভিশাপ।

'এক মিনিট,' বলল রাসেল। 'কথাটা কি সত্যি, কায়রোয় অনেক লোক খুন হয়েছে?'

'সত্যি,' বলল টাটা। 'থানায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো। পুলিস কোন কেসই নিতে চাইছে না। বলছে, আত্মা যদি খুনী হয়, তারা কাকে গ্রেফতার করবে? কেউ যদি অভিশাপে মারা যায়, তাদের কি করার আছে?'

'মহুয়াদি, ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন

বাংলাদেশেই আছি,' বলল রাসেল। 'ঢাকার মত কায়রোর পুলিসও দেখা যাচ্ছে অযোগ্যতা ঢাকার জন্যে কুসংস্কারকে ব্যবহার করে। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে বিদঘুটে লাগছে।'

'বিদঘুটে মানে কি?' জিজ্ঞেস করল টাটা। 'শব্দটা আগে কখনও শুনিনি।'

'বিদঘুটে মানে গর্দভ,' ব্যঙ্গ করল রাসেল। 'তোমার বক্তব্য শেষ করো।'

আবার শুরু করল টাটা। সে আর ডোনা বন্ধু জেফরিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই থেকে রাস্কেল তামামাকে অনুসরণ করছিল তারা। আশা করছিল এমন কিছু জানতে পারবে যা শুনলে পুলিস গ্রেফতার করতে রাজি হবে তামামাকে।

আজও তামামাকে অনুসরণ করছিল ওরা, এই সময় কুয়াশা তাকে পাকড়াও করেন। সেজন্যেই তামামা যখন খুন হলো, অকুস্থলের আশপাশে তাদেরকে দেখা গেছে।

রাসেল টাটার ভুলটা ধরিয়ে দিল, বলল, 'তামামাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছিলেন মি. শহীদ খান, বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ–কুয়াশা নন।'

মহুয়া বলল, 'অনেক কথাই বললে তোমরা, কিন্তু আসল রহস্যটা সম্পর্কে তো কিছুই বললে না। আগেও লোকজন খুন হয়েছে, আজ তামামা আর জেফরি মারা গেল, এর কি ব্যাখ্যা? আত্মা, ভূত, অভিশাপ–এ-সব তো বোকা বানাবার জন্যে বলা হচ্ছে। কেউ একজন খুনগুলো করছে, আর দোষ চাপাচ্ছে ফারাও জুব্বাহ্ নেদের ওপর।'

টাটা বলল, 'আমরা যতটুকু জানি ততটুকু বললাম।'

তাকে সমর্থন করে ডোনাও মাথা ঝাঁকাল।

রাসেল বলল, 'তামামা শহীদ ভাইকে নিয়ে ওই বাড়িটায় গিয়েছিল ঘুমোন-এর সঙ্গে দেখা করতে। ঘুমোন কে? ঘুমোন

নামে কাউকে তোমরা চেনো?'

না, ঘুমোন নামে কাউকে তারা চেনে না।

রাসেল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এক মিনিট! তামামা যে বাড়িতে মারা গেছে, এখন যেখানে শহীদ ভাই রয়েছেন, সিটি ফোন গাইডে বলা হয়েছে ওই বাড়ির মালিক আলি বকরি।'

'আলি বকরি!' চেঁচিয়ে উঠল টাটা। 'বকরি তো ওই বাড়ির চাকর ছোঁড়া, যে তোমাদের চোখের সামনে অ্যাক্সিডেন্টালি মারা গেল!'

রাসেলের চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল। 'সে কথা তুমি জানলে কিভাবে?'

'কেন, আমরা বলিনি?' জিজ্ঞেস করল টাটা। 'এই আলি বকরিকে আজই আরও সকালে তামামার সঙ্গে দেখেছি আমরা। একটা রেস্তোরাঁয় বসে একসঙ্গে নাস্তা খেয়েছে ওরা।'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রাসেল। 'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। শহীদ ভাইকে দরকার। যাই, আরেকবার টেলিফোন করে দেখি।'

অনেকক্ষণ ধরে রিঙ হচ্ছে, কিন্তু অপরপ্রান্তে কেউ রিসিভার তুলছে না। যোগাযোগ কেটে দিয়ে আবার রিঙ করল রাসেল। এবারও অনেকক্ষণ ধরে রিঙ হলো। একই অবস্থা, কেউ ধরছে না। উঠানে মহুয়া আর লীনাকে রেখে এসেছে, ওদের নিরাপত্তার কথা ভেবে অস্থির লাগছে তার। আরও এক মিনিট চেষ্টা করল সে। সাড়া পেতে ব্যর্থ হয়ে পা চালিয়ে বেরিয়ে এল উঠানে। 'কেউ ধরছে না। আমাদের উচিত ফিরে গিয়ে দেখা...'

কিছু একটা ঘটেছে। সবাই ওরা আড়ষ্ট। তার দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'কি হলো তোমাদের?' জিজ্ঞেস করল রাসেল।

তার পিছন থেকে অচেনা একটা গলা ভেসে এল, 'ওরা তোমাকে সাবধান করার সুযোগ পায়নি, তাই পাথর হয়ে গেছে।'

লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিল রাসেল, কিন্তু সেটা আত্মঘাতী হবে ভেবে নড়ল না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে একটা ঢোক গিলল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমি ঘুরতে পারি?'

কেউ জবাব দিল না।

মহুয়া, লীনা, টাটা ও ডোনার মুখভাব লক্ষ করছে রাসেল। যা দেখল, তাতে মনে কোন সন্দেহ থাকল না যে পিছন থেকে ওকে গুলি করতে যাচ্ছে লোকটা।

নিস্তব্ধতা ভাঙল ডোনা। চিৎকারটাকে রোমহর্ষকই বলতে হবে। 'ইনিই আমার অভিভাবক! ইনিই আমার প্রহরী! হায় কপাল!'

বেসুরো গলায় রাসেল জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কি আমাকে গুলি করবে?'

পিছন থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। 'গুলি করব? কি দিয়ে?'

বন করে আধ পাক ঘুরল রাসেল। লম্বা এক লোক, বয়েস ত্রিশ হতে পারে, কাঁধ দুটো বিশাল, মাথায় মরচে ধরা লোহার মত চুল, সকৌতুকে হাসছে। হাত দুটো খালি। । 'কে তুমি?' রেগেমেগে জিজ্ঞেস করল সে।

কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল লোকটা। 'আমি অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ, সরল ও রোমান্টিক, কখনও বিষণ্নতার প্রতীক, চিরকেলে আনন্দ বার্তা–মারিয়ো পেত্রা।'

চোখ মিট মিট করল রাসেল। 'এত কিছু? শুনে মনে হলো, পল্টনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক ভাষণ শুনলাম।'

'অপেক্ষা করো,' বলল লোকটা। 'আমার সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানার সুযোগ হবে তোমার।'

লীনার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল রাসেল। 'কি ব্যাপার? তোমরা সবাই আমার দিকে ওভাবে তাকিয়েছিলে কেন?'

'এই লোক হঠাৎ একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ল আমাদের সামনে,' বলল লীনা। 'আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।'

'আকাশ থেকে পড়লাম, সত্যি আকাশ থেকে পড়লাম!' বলল মারিয়ো পেত্রা। 'তিনতলার জানালাকে আকাশ বলতে আমার কোন আপত্তি নেই।' রাসেল, মহুয়া আর লীনার দিকে আঙুল তাক করল সে। 'তোমাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেছি। তোমরা যখন ঢুকলে, আমি তখন বাইরে থেকে সব দেখলাম। হায় কৌতূহল, তোমারই জিত হলো!'

রাসেল মাথা চুলকে ডোনাকে জিজ্ঞেস করল, 'এই বাচাল লোকটাকে তুমি চেনো?'

ডোনা মাথা কাত করল। 'ও আমার পাহারাদার।'

'পাহারাদার?'

'স্বেচ্ছায় নিযুক্ত।'

বৃষস্কন্ধ পেত্রা বলল, 'শব্দটা পাহারাদার নয়। আসলে রক্ষক। কিংবা দেহরক্ষী।'

'তুমি শিয়ালের ভেজা ঠ্যাং!' কর্কশ গলায় বলল টাটা, চোখে-মুখে রাজ্যের অসন্তোষ।

'সামনের, না পিছনের?' জিজ্ঞেস করল রাসেল।

'টাটাগিলে, আমাকে দেখে তোমার চমকে গেছে পিলে,' বলল পেত্রা। হাসছে সে।

'তোমাকে আমি পছন্দ করি না, পেত্রা।' টাটা অন্য দিকে ফিরে আছে।

'তো কি হলো?' জানতে চাইল পেত্রা।

'আমার উচিত,' বলল টাটা, 'কষে তোমাকে ধোলাই দেয়া।'

'ধোপা হতে চাইলে আগে নিজের নোংরা কাপড় পরিষ্কার

করো হে,' জবাব দিল পেত্রা।

'তোমরা থামবে!' ঝগড়াটা থামাবার জন্যে ধমকে উঠল রাসেল।

কিন্তু ওরা দু'জন তার কথায় কান দিচ্ছে না।

'যীশুর কিরে, আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে!' মারমুখো ভঙ্গিতে পেত্রার দিকে ফিরল টাটা।

'কিন্তু অন্ধকার একটা গলি না পেলে তুমি আমার বুকে গুলি করবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল পেত্রা। 'পিঠে ছুরি মারতে হলেও তো নির্জন একটা জায়গা দরকার, তাই না?'

হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিল টাটা, তবে বেশিদূর যেতে পারল না, রাসেল তাকে ধরে ফেলেছে। ওদিক থেকে পেত্রাও মারার জন্যে ছুটে আসছিল, তার পথ আগলে দাঁড়াল মহুয়া।

'ওদেরকে লড়তে দেয়া উচিত,' বলল লীনা। 'আমি কখনও ষাঁড়ের লড়াই দেখিনি, এই সুযোগে দেখে নিতাম।'

ডোনা বলল, 'ওরা যদি লড়ে, সেই লড়াই আমি দেখতে চাই না।' রাসেলের একটা হাত ধরল সে, তাকে নিয়ে একটা দরজার দিকে এগোল

কামরার ভেতর ধুপের গন্ধ ভাসছে। সিলিংটা অনেক ওপরে। 'তোমার বন্ধু?' ডোনাকে জিজ্ঞেস করল রাসেল।

'কে, পেত্রা? হ্যাঁ, বন্ধুই বলা চলে। রোজ না হলেও, প্রায়ই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে। এটা ওর এক ধরনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।'

'পেত্রা তোমাকে বিয়ে করতে চায়, আবার টাটাও তোমাকে বিয়ে করতে চায়?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল ডোনা, হঠাৎ যেন একটু উদাস হয়ে পড়ল। 'সেজন্যেই পরস্পরকে ওরা সহ্য করতে পারে না।'

সুন্দরী মেয়েদের এই একটা বিপদ, ভাবল রাসেল। 'এই পেত্রা আসলে কে, ডোনা?'

'পেত্রা ফরাসী। একটা তেল কোম্পানির কেমিস্ট। আরব আর মিশরে বহু বছর ধরে আছে।'

একটু পরই কামরায় ঢুকল টাটা আর পেত্রা। হাত তুলে নেকটাই আর কোট ঠিকঠাক করছে দু'জনই, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে রক্তচক্ষু মেলে। ওদের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল মহুয়া ও লীনা।

রাসেল বলল, 'জেফরি খুন হয়েছে, পুলিসকে একটা খবর দেয়া দরকার।'

মারিয়ো পেত্রা বলল, 'এক মিনিট অপেক্ষা করো। আমার কিছু বলার আছে।'

'তুমি এই রহস্য সম্পর্কে কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল রাসেল।

'এই রহস্য মানে ফারাও জুব্বাহ নেদের অভিশাপের কথা বলছ তো? জেফরি যেভাবে মারা গেল, লোকজন যেভাবে মারা যাচ্ছে? প্রথমে মুখের কোথাও হলুদ একটা দাগ দেখা যায়, তারপরই মারা যায় তারা, সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় দাগটা...'

মহুয়া বলল, 'এ-সব আমরা জানি।'

'তোমরা ঘুমোন নামে কাউকে চেনো?' রাসেলকে জিজ্ঞেস করল পেত্রা।

রাসেল বলল, 'নামটা শুনেছি। আমাদের লীডার, প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শহীদ খানকে এই ঘুমোনের কাছেই নিয়ে যাচ্ছিল তামামা।'

'শুধু এইটুকু জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে,' বলল পেত্রা, 'তোমরা কিছুই জানো না।'

'তাই?'

'এই ঘুমোন মিশরের একটা নৃশংস দানব–শুধু রূপকথায় নয়, বাস্তবেও তার অস্তিত্ব আছে,' বলল পেত্রা। 'আতঙ্ক আর রহস্যের অপর নাম ঘুমোন, অন্তত লোকজন তাই বলে আর কি।'

'কে কি বলে জানতে চাই না,' বলল রাসেল। 'আসলে সে কে? কি করে? কোথায় থাকে? কাকে ভয় দেখায়?'

পাল্টা প্রশ্ন করল পেত্রা। 'হিটলার কাকে ভয় দেখাত?'

'তাকে যারা চিনত তাদের সবাইকে। কিন্তু হিটলার প্রসঙ্গ উঠছে কেন...'

'এই ঘুমোনও একটা হিটলার, তাকে যারা চেনে তাদের সবাইকে সে ভয় দেখায়। তবে একটা পার্থক্য আছে। হিটলার ছিল পাবলিক ফিগার। কিন্তু ঘুমোন থাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে।'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকে মানে?'

'তাকে তুমি খোদ শয়তানও বলতে পারো। তার সম্পর্কে অনেক কিছুই তুমি জানো। কিন্তু কখনোই দেখতে পাও না।'

টাটা আর ডোনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রাসেল। 'এই ঘুমোন সম্পর্কে জানো তোমরা?'

'সামান্যই,' বলল ডোনা। 'নিশ্চিন্তভাবে কিছু জানি না।'

'আমিও তাই, উড়ো উড়ো দু'একটা কথা কানে এসেছে,' বলল টাটা, ভাবটা যেন পেত্রার তোলা কোন প্রসঙ্গে একমত হতে রাজি নয় সে।

'ঘুমোন সম্পর্কে এত কথা আমি জানলাম কিভাবে?' প্রশ্ন করল পেত্রা, তারপর নিজেই জবাব দিল, 'তাহলে খুলেই বলি। ডোনার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি চিন্তিত। সত্যি কথা বলতে কি, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাই সে কার সঙ্গে মেলামেশা করছে আমার জানা দরকার। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি...'

'সাবধান! খবরদার!' ইটালিয়ান ভাষায় হুঙ্কার ছাড়ল টাটা।

'আমাকে যদি ঘুমোন বলে মিছামিছি সন্দেহ করো...'

তাকে বাধা দিল পেত্রা। 'তুমি ঘুমোন হলে তো কোন সমস্যাই ছিল না। ঘাড়টা ধরে মটকে দিতাম। কিন্তু, না, আমি বলতে চাইছি, খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি তোমার বন্ধু জেফরির সঙ্গে ঘুমোনের একটা যোগাযোগ ছিল। তোমারও যোগাযোগ আছে, এটা প্রমাণ করতে পারছি না–সেজন্যে আমার মনে শান্তি নেই।'

'ব্যাটা মিথ্যুক!' পেত্রাকে ভেঙচাল টাটা।

রাসেলের দিকে ফিরে হাসল পেত্রা। 'আমি এক লোককে চিনি। যে ঘুমোনকে চেনে। তোমরা চাও, ওই লোকের কাছে তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাই?'

লাফিয়ে উঠল রাসেল। 'এতক্ষণে একটা কাজের কথা বললে! চলো, এখুনি চলো...'

পাঁচ

জায়গাটা কাসরেন-নিল ব্রিজ থেকে নীল নদের উজানে। এই ব্রিজ গেজিরা দ্বীপে পৌঁছেছে। দ্বীপে ইসমাইল-এর প্রাসাদ আছে, তবে সেটা অনেক কাল আগেই রূপান্তরিত করা হয়েছে বিলাসবহুল হোটেলে।

এদিকের ভূমি নিচু। ঝোপঝাড় আর গাছপালা প্রচুর, বাড়ি-ঘর খুবই কম। প্রাচীন প্রাচীর, আকাশছোঁয়া টাওয়ার, ফুলবাগান, ফোয়ারা সহ পার্ক, ব্যস্ত চৌরাস্তা, চোখ-ধাঁধানো বিশাল সব প্রাসাদ, মসজিদের গম্বুজ ও মিনার ইত্যাদি পিছনে ফেলে এল

ওরা। ওদের সামনে চওড়া নীলনদ, এখানে-সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে দ্বীপগুলো, দক্ষিণ দিগন্তে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে কয়েকটা পিরামিড।

'ওই যে হাউজবোটটা,' বলল মারিয়ো পেত্রা। 'লোকটা এখন থাকতেও পারে। আমি জানি না।'

'কেমন লোক? কি করে?' জানতে চাইল রাসেল।

'জ্যান্ত একটা কঙ্কাল বললেই চলে। কপালে বিরাট একটা ক্ষত। একটা দাঁতও নেই। ভিখারিদের সর্দার সে।'

'বোটটা একটা ফাঁদও হতে পারে,' লীনা আর মহুয়াকে ফিসফিস করে বলল রাসেল। 'আপনারা ওটায় চড়ুন, মহুয়াদি। আমি বাইরে পাহারায় থাকি। বিপদের আভাস পেলেই চিৎকার দেবেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাউজবোটের দিকে এগোল ওরা। ওদের সামনে রয়েছে পেত্রা, টাটা ও ডোনা।

হাউজবোটের নাক অনেকটাই পানিতে ডোবা, যেন ডাইভ দেয়ার পাঁয়তারা কষছে। করুণ চেহারা দেখে মনে হলো এটা বোধহয় পরিত্যক্ত। তবে মাস্তুল আছে, মাস্তুলে ছেঁড়া পালও আছে। খুব সাবধানে বোটে চড়ল ওরা। কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখল না।

পেত্রা বলল, 'কেউ যখন নেই, আমরা বরং বাইরে অপেক্ষা করি। কেউ এলে আড়াল থেকে দেখতে পাব।'

একটু পরই বোট থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কিন্তু রাসেলকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীর পরীক্ষা করা হলো। বালি ও মাটি এলোমেলো হয়ে আছে। রাসেলের কোটের ছেঁড়া একটা অংশও পাওয়া গেল। আর পাওয়া গেল কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত।

'রাসেলকে কেউ কিডন্যাপ করেছে,' বলল লীনা, মুখ শুকনো পানপাতা।

লেখাটা ডোনা আবিষ্কার করল। 'আশ্চর্য, আগে এখানে ছিল না!'

সমতল পাথরের গায়ে পেন্সিল দিয়ে কয়েকটা কথা লেখা হয়েছে, বড় বড় হরফে–

> 'এখানেই অপেক্ষা করো তোমরা। তোমাদের সঙ্গে আমাদের জরুরী আলাপ আছে। তোমাদের বন্ধু মারা যায়নি–এখনও।'

তামামা ও আলি বকরি মারা যাবার পর দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এখনও বাড়িটা ছেড়ে বেরোয়নি শহীদ। দুটো প্রশ্ন বারবার ফিরে আসছে ওর মনে। এখানে কি ও সময় নষ্ট করছে? ওরা গেল কোথায়–মহুয়া, রাসেল আর লীনা?

খানিক আগে একটা চাপা গুঞ্জন ধ্বনি শুনেছিল। শব্দটা এখন আবার হচ্ছে। সম্ভবত কোন পোকা ডাকছে।

টেলিফোন নয়তো? প্রশ্নটা মনে জাগতেই তল্লাশী চালাল। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজার পর একটা কাঠের বাক্সের ভেতর রাজ্যের টুকিটাকি জিনিসের তলায় পাওয়া গেল রিসিভারটা, অন্যান্য বাক্সের ভিড়ে কালো তারটাও এতক্ষণ চোখে পড়েনি। কিন্তু ফোন এখন আর বাজছে না।

আবার তামামার কাছে ফিরে এল শহীদ, এবার নিয়ে তিনবার। এখনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না লোকটা কিভাবে মারা গেছে। তবে জানে কিসে মারা গেছে।

একটা লোক চিড়ে-চ্যাপ্টা হলে বোঝা যায়, কিন্তু কি দিয়ে তাকে চিড়ে-চ্যাপ্টা করা হয়েছে সেটা লাশ দেখে বোঝা না-ও যেতে পারে। জবাই করে খুন করা হলেও বোঝা যায়, কিন্তু কি দিয়ে জবাই করা হয়েছে তা বোঝা না-ও যেতে পারে।

এ পর্যন্তই এগোতে পেরেছে শহীদ।

ও জানে লোকটাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

কিভাবে? এ প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ নয়।

বাড়িটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশী করেছে শহীদ। আরবীতে লেখা কাগজ-পত্রের ওপর চোখ বুলিয়েছে। বাড়িটা আলি বকরির নামে লীজ নেয়া। একটা চাকরের নামে বাড়ি লীজ নেয়া হলো কেন?

তামামা ওকে বলেছিল এই বাড়িতে এলে ঘুমোনের সঙ্গে দেখা হবে। অথচ বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি, একমাত্র আলি বকরিকে ছাড়া। ঘরগুলোর যে বেহাল অবস্থা, দেখে মনে হয় না এখানে সম্প্রতি কেউ বসবাস করেছে।

তামামার লাশের দিকে তাকিয়ে আছে শহীদ। হেরে যাবার একটা অনুভূতি হতাশ করে তুলছে ওকে। কামালের সন্ধানে তদন্ত শুরু করার পরই মারামারি, খুন-খারাবি শুরু হয়ে গেছে। এ থেকেই বোঝা যায়, কামাল অত্যন্ত শক্তিশালী একটা সিন্ডিকেটের হাতে পড়েছে।

কামালের সন্ধান পাবার একমাত্র সূত্র ছিল তামামা। সে খুন হওয়ায় সেই সূত্রও হাতছাড়া হয়ে গেছে। শহীদের মনে হলো, কেউ যেন ওর হাত-পা বেঁধে রেখেছে।

বাড়ির ভেতর ফোয়ারা পাওয়া গেল, বিশাল এক বাথটাবও বলা চলে। কাপড়চোপড় খুলে ফোয়ারায় নামল ও। ভাল করে গোসল করল।

গোসল শেষ করে কাপড়চোপড় পরল। ভারী গলা আর পদশব্দ ঢুকল কানে। দরজায় দেখা গেল কায়রো মেট্রোপলিটান পুলিসের একজন ইন্সপেক্টরকে, সঙ্গে তিনজন সহকারী। সবার পিছনে আরও এক ভদ্রলোক, সিভিল ড্রেসে।

'বাড়িতে দুটো লাশ পড়ে আছে, আর তুমি আয়েশ করে গোসল করছ?' হাতে হ্যান্ডকাফ, শহীদের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে

এল ইন্সপেক্টর। 'এমন ঠাণ্ডা মাথার খুনী সহজে দেখা যায় না।'

সিভিল ড্রেস পরা এসবি অফিসার কাওসার কাইয়ুম হঠাৎ চিনতে পারল শহীদকে। 'থামুন!' বলল সে। 'ইনি বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। কাল রাতে পরিচয় ও আলাপ হয়েছে। উনি সিরিয়াল মার্ডার কেসে আমাদেরকে সাহায্য করছেন।' এগিয়ে এসে শহীদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল কাইয়ুম। 'মি. শহীদ, আপনার সহকারীর কোন সন্ধান পেলেন?'

শহীদ মাথা নাড়ল। 'কিন্তু আপনারা এখানে কেন?'

'অজ্ঞাতনামার টেলিফোন কল পেয়ে এসেছি,' বলল কাইয়ুম। 'বলা হয়েছে আলি বকরি আর তামামা আলি বকরির বাড়িতে খুন হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারলে খুনীকে হাতেনাতে ধরা যেতে পারে।'

শহীদ বলল, সে একটুও অবাক হচ্ছে না। ওকে বিব্রত করতে চায় এমন লোক এই কাজই করবে। আসলে কি ঘটেছে, ধীরে ধীরে সব ব্যাখ্যা করল ও, কিছুই গোপন করল না।

শহীদ থামতে পুলিশ ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করল, 'মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'তামামা পুড়ে মারা গেছে। আলি বকরি মারা গেছে দুর্ঘটনায়।'

ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু আমি যতদূর জানি, ভূত বা আত্মা আগুনকে সাংঘাতিক ভয় পায়।'

শহীদের চেহারায় কঠিন ও ঠাণ্ডা ভাব ফুটল। 'এই মৃত্যুর সঙ্গে ভূত বা আত্মার কোন সম্পর্ক নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করল এসবি অফিসার কাইয়ুম। 'এর আগের কয়েকটা লাশ দেখে আমাদের একজন এক্সপার্ট বলেছেন, ঝলসানো হয়েছে।'

'ক্লিনিক্যালি পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন,' বলল শহীদ। এই

বার্ন-এর মাত্রা ফার্স্ট থেকে ফোর্থ ডিগ্রী পর্যন্ত। বেশিরভাগ পোড়া অংশ সেকেন্ড ডিগ্রী। ফিফথ ও সিক্সথ ডিগ্রী বার্ন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সিক্সথ ডিগ্রী বার্নে হাড়ও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অন্যান্য টক্সিক অ্যাফেক্টও থাকতে পারে, তবে নিশ্চিত হবার জন্যে ল্যাবরেটরিতে টিস্যু অ্যানালাইসিস করতে হবে।'

'পোড়াটা ঠিক কোথায় বলুন তো?' জানতে চাইলেন কাইয়ুম।

'মুখ, নাক, নাকের ভেতর সুড়ঙ্গ, মুখের ভেতর, গলার ভেতর, ফুসফুসে। হাত সামান্যই পুড়েছে।'

'হলুদ দাগটার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই?'

'না।'

'লোকটা যখন মারা যাচ্ছিল, তার আশপাশে খালি চোখে কিছুই দেখা যায়নি?'

'কিছু ছিল কিনা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। আলো খুব কম ছিল।'

'আপনি কিছুই দেখেননি?'

মাথা নাড়ল শহীদ। 'আলো খুবই কম ছিল।'

'কি জানেন, মি. শহীদ,' বলল কাইয়ুম, 'আপনিই প্রথম নির্ভরযোগ্য সাক্ষী, যিনি নিজের চোখে এই রহস্যময় মৃত্যু চাক্ষুষ করেছেন।'

'এভাবে আর ক'জন মারা গেছে?'

'তিনজনের কথা জানি আমরা। নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, বারোজন। আর যদি গুজবে কান দেন, লাশের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়ে যাবে।' ভুরু কুঁচকে চিন্তা করল এসবি অফিসার। 'আমার ধারণা বিশ-পঁচিশজন হবে।'

'কিন্তু তাহলে মাত্র তিনজনের কথা জানেন বলছেন কেন?'

'এই রহস্যময় মৃত্যু শুধু অপরাধীদেরই আঘাত করছে,' বলল অফিসার। 'তাদের আত্মীয়-স্বজন পুলিসকে খবর দেয় না।'

'শুধু অপরাধীরা খুন হচ্ছে?' হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল শহীদ।

যেন ওর মনের কথা পড়তে পেরেই অফিসার বললেন, 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী মি. কুয়াশা বেশ কিছুদিন হলো কায়রোয় এসেছেন একটা সেমিনারে যোগ দেয়ার জন্যে। কিন্তু সেখানে তাকে একদিনও হাজির হতে দেখা যায়নি। হয়তো যাচ্ছেন, কিন্তু আমরা তাঁর ছদ্মবেশ ধরতে পারছি না। সে যাই হোক, শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি ফারাওদের মমি নিয়ে গবেষণা করছেন গোপনে কোথাও। এখন প্রশ্ন হলো, মি. শহীদ, উনি কি এই রহস্যের সঙ্গে জড়িত হতে পারেন? আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, মাঝে মধ্যে ক্রিমিনালদের ওপর চড়াও হন তিনি। বাংলাদেশে তার হাতে বহু মানুষ খুন হয়েছে।'

ব্যাপারটা শহীদকে ভাবিয়ে তুললেও, মুখে বলল, 'কুয়াশা বিদেশে এসে এ-ধরনের একটা কাজ করবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। যদি করত, অজুহাত হিসেবে ফারাও জুব্বাহ নেদের আত্মাকে খাড়া করত না।'

'নিজের গা বাঁচানোর জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক সময়...'

'কুয়াশা যদি এই রহস্যের জন্যে দায়ী হয়, তাহলে আমার সহকারী কামাল নিখোঁজ হলো কেন?' জিজ্ঞেস করল শহীদ। 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, তামামার নামটা কুয়াশাই আমাকে জানিয়েছে।' একটু থেমে শহীদ বলল, 'কুয়াশা প্রসঙ্গ থাক। আপনি বরং ফারাও নেদ সম্পর্কে কি জানেন বলুন।'

'উনি একজন অতি প্রাচীন ফারাও,' বলল কাইয়ুম। 'শোনা কথা, কয়েক মাস আগে তাঁর সমাধি খোলা হয়, ভেতরের জিনিস-পত্র সব চুরি হয়ে গেছে। এই কাজে যারা জড়িত ছিল, একে একে তারাই মারা যাচ্ছে। এখন বলুন, লোকে যদি বলে ফারাওয়ের অভিশাপে মারা যাচ্ছে ওরা, তাদের আর দোষ কি?'

'এই চুরির কাজে তামামা জড়িত ছিল?'

'আসলে আমরা জানি না। এমন কি এ-ও জানি না যে সত্যি কোন সমাধি ছিল কিনা। তবে তামামা যে-ধরনের লোক ছিল, সে তার মায়ের সমাধি ভাঙলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকত না। আর অভিশাপের প্রসঙ্গে মানুষ যা বলছে, তার পিছনে যুক্তি হলো যখনই কোন ফারাওয়ের সমাধি ভাঙা হয়েছে তখনই সংশ্লিষ্ট বহু লোক অপঘাতে মারা গেছে। এটা তো আর মিথ্যে নয়। তুতেন খামেনের কথাই ধরুন না। ওই সমাধি খোলার পর বিচিত্র বহু ঘটনা ঘটেছে, মারাও গেছে বহু লোক।'

'গাঁজা,' বিড়বিড় করল শহীদ।

প্রতিবাদ করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল কাইয়ুম। 'গাঁজা নয়, এমন একটা জিনিস আপনাকে আমি দেখাতে পারি, মি. শহীদ।'

'কি?'

'চলুন, একটা কনফারেন্সে নিয়ে যাই আপনাকে। ওঁরা কি বলে শুনুন। আপনার যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে, তদ্বির ছাড়াই আমন্ত্রণ লিপি আদায় করা সম্ভব। সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে পরিচয়বিহীন এক সূত্র থেকে জানা গেছে এই কনফারেন্সে মি. কুয়াশাও উপস্থিত থাকবেন অবজারভার হিসেবে।'

আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স সহ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করছে সত্তরটা দেশ, বেশিরভাগই তৃতীয় বিশ্বের সদস্য। বাংলাদেশী প্রতিনিধিদলের নেতার সঙ্গে শহীদের পরিচয় আছে, দেখা হতে কুশল বিনিময় করল ওরা।

এসবি অফিসার কাইয়ুম কনফারেন্সের আয়োজক মিশরীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে শহীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, বলেছে, 'কনফারেন্সে যে বিষয়ে আলোচনা করা হবে, ওই একই বিষয়ে তদন্ত করছেন মি. শহীদ খান, কাজেই তাঁকে অবজারভার

হিসেবে আমন্ত্রণ করা হোক।' এরপর আমন্ত্রণলিপি পেতে কোন অসুবিধে হয়নি।

অবজারভারদের জন্যে বসার আলাদা ব্যবস্থা। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে শহীদ, আশা কুয়াশাকে দেখতে পাবে। ওর পাশেই বসেছেন একজন মিশরীয় সাংবাদিক, শহীদের সঙ্গে যেচে পড়েই আলাপ করলেন আরবী ভাষায়, ভাব দেখে মনে হলো তিনি ইংরেজি জানেন না। ভদ্রলোকের নাম আবদেল মোরসালিন আল দীন। আল দীন সাহেবকে দৈত্য বললেই হয়, কমপ্লিট স্যুটের ওপর আলখেল্লা চাপিয়েছেন, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা। এই লোককে কুয়াশা বলে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, কারণ তাঁর চোখে অসম্ভব মোটা কাঁচের চশমা রয়েছে। কথায় কথায় বললেন, তাঁর চোখে ছানি পড়েছিল, সেটা অপারেশন করতে গিয়ে ডাক্তার কিছু ভুলভাল করে বসে, তারই পরিণতি এই চশমা। খালি চোখে তিনি কিছুই দেখতে পান না। ভদ্রলোক জাতীয় দৈনিক আল আহ্‌রাম-এ চাকরি করেন।

কনফারেন্সের সুষ্ঠু আয়োজন ও উপস্থিত প্রতিনিধিদের মর্যাদা দেখেই শহীদ বুঝতে পারল, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে এঁরা সবাই মিলিত হয়েছেন এখানে।

এক তরুণ রিপোর্ট পড়তে শুরু করল।

শহীদ শুনছে। হঠাৎ গভীর হলো মনোযোগ, উপলব্ধি করল, বিভিন্ন দেশের ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পড়ে শোনাচ্ছে তরুণ। এ-ও পরিষ্কার হয়ে গেল যে সংশ্লিষ্ট দেশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চগুলো একটা হেডকোয়ার্টার বা সেন্ট্রাল অফিসের নির্দেশ-পরামর্শে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল, তারই ফলশ্রুতি এই রিপোর্ট।

ধীরে ধীরে আলোচ্য বিষয় পরিষ্কার হতে শুরু করল। এটা রাজনৈতিক কোন বিষয় নয়। অথচ সরকার উৎখাত, জোর করে

ক্ষমতা দখল, সামরিক অভ্যুত্থান ইত্যাদি কুকীর্তি নিয়েই আলোচনা শুরু হলো। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আঞ্চলিক নেতারা হঠাৎ করে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে স্বাধীনতা চেয়ে বসছে। রাশিয়ার কথা বলা হলো–দেশটা অর্থনৈতিকভাবে দেওলিয়া হয়ে যাবার পিছনে কারণ কি? ঝাড়খণ্ড নিয়ে ভারতে কারা অশান্তি সৃষ্টি করছে, কার প্ররোচনায়? বাংলাদেশের কথাও তোলা হলো–নির্বাচিত হয়ে যে দলই ক্ষমতায় আসুক, বিরোধী দল হরতাল নামে ভয়াবহ মারণাস্ত্র ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, এর পিছনে নেপথ্যে কেউ না থেকেই পারে না। এরকম আরও বহু দেশের সমস্যার কথা বলা হলো। বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে একটাই নাম, একই অর্গানাইজেশনের কথা জানা যাচ্ছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনে এই লোকটা আর তার অর্গানাইজেশনই দায়ী।

বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় তৎপর সে। দ্বিতীয় সারির রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, প্রস্তাব দিচ্ছে–আমি তোমাকে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, প্রিমিয়ার বা রাজা বানাব; তুমি শুধু আমার নির্দেশ মত কাজ করো। আমরা শত শত নয়, হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করব।

কে এই লোক? তার শুধু নামটাই জানা গেছে। ঘুমোন।

গোটা ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য, অথচ বাস্তব।

এসবি অফিসার কাওসার কাইয়ুম বলল, 'এখন বুঝতে পারছেন তো, মি. শহীদ, ব্যাপারটা কত বড়?'

'তাহলে আপনার ধারণা, ফারাও জুব্বাহ নেদের নামে যে খুনগুলো করা হচ্ছে তা আসলে এই কিং-মেকারের কাণ্ড?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

'আপনার কথা শোনার পর আইডিয়াটা এল আমার মাথায়,'

বলল কাইয়ুম। 'তামামা আপনাকে বলেছিল ঘুমোনকে বলে আপনাকে একটা কাজ পাইয়ে দেবে, ঠিক? মোটাবুদ্ধির তামামার পক্ষে এ-ধরনের গর্ব করা স্বাভাবিক। কিছুদিন থেকে দু'হাতে টাকা খরচা করছিল তামামা, কাজেই ধরে নিতে হয় ঘুমোনের হয়ে কাজ করছিল সে। আরও ধরে নিতে হয় ফারাও নেদ রহস্যের সঙ্গে ঘুমোনেরও সম্পর্ক আছে।'

ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, উপলব্ধি করল শহীদ। এ তো দেখা যাচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ার অবস্থা। কামাল নিখোঁজ হবার রহস্যটা তেমন জটিল মনে হয়নি ওর, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রহস্যটা চারদিকে ডালপালা ছড়াচ্ছে। এই রহস্যের মধ্যে কুয়াশার ভূমিকাও স্পষ্ট নয় ওর কাছে। 'আমার সহকারী মি. কামালের কপালে কি ঘটেছে, সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?' জানতে চাইল ও।

'এখনও নেই,' জবাব দিল কাইয়ুম।

কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ শহীদ খেয়াল করল, মিশরীয় সাংবাদিক আবদেল মোরসালিন আল দীন-এর সোফাটা খালি। না, ঠিক খালি নয়–মোরসালিনের প্রকাণ্ড দেহটা সোফায় না থাকলেও, মোটা কাঁচের চশমাটা রয়েছে। যে ভদ্রলোক চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পান না, তিনি কি সেটা ভুলে ফেলে যাবেন?

তাহলে কি ওকেও ফাঁকি দিল কুয়াশা?

পাটে বসার প্রস্তুতি নিচ্ছে সূর্য। কারসেন-নিল ব্রিজ থেকে ভাটির দিকে, নীলনদের পাড়ে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-এর গায়ে হলুদ-কমলা রঙের রোদ বেলাশেষের খেলা খেলছে। দক্ষিণে এরইমধ্যে হালকা কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেছে পিরামিডগুলো।

মহুয়া, লীনা, কাউন্ট টাটা, মারিয়ো পেত্রা ও ডোনা অপেক্ষা

করছে। রাসেল যেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছে সেখানকার একটা পাথরে লিখিত নির্দেশ পেয়েছে ওরা—এখানেই অপেক্ষা করতে হবে ওদেরকে। লিখিত নির্দেশ ওরা পুরোপুরি পালন করেনি। মহুয়ার নেতৃত্বে গোটা এলাকা তল্লাশী চালিয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। রাসেল কিডন্যাপ হয়ে থাকলে তাকে নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক দূরে কোথাও সরে গেছে কিডন্যাপাররা।

'শহীদ ভাই কি করছেন জানতে পারলে হত,' বলল লীনা।

মহুয়া কিছু বলল না। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

অকস্মাৎ আরবী ভাষায় কে যেন কথা বলে উঠল, 'আল্লাহ ও যীশু তোমাদের মঙ্গল করুন।' চমকে উঠল সবাই। ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল একপাশের গাঢ় ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে লোকটা। পরনে আলখেল্লা থাকলেও, হাত দুটো বাইরে বের করা। দুই হাতের আটটা আঙুলে দামী পাথর বসানো আঙটি পরে আছে সে। স্থূল, গোলগাল কাঠামো। গলাতেও সোনার মোটা চেইন। চোখে চশমা, ফ্রেমটাও সোনার।

'কি চাই?' মহুয়াই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'এখানে কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে?'

'তোমরা আমার জন্যেই অপেক্ষা করছ,' বলল লোকটা, এবার ইংরেজিতে।

হাত তুলে পাথরের লেখাটা দেখাল মহুয়া। 'এটা তোমার লেখা?'

'হ্যাঁ।'

জবাবটা শুনেই কারাতের একটা ভঙ্গি নিয়ে ফেলল একযোগে মহুয়া আর লীনা।

লোকটা শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি চাও মি. রাসেল খুন হয়ে যাক?'

মহুয়া আর লীনা পরস্পরের দিকে তাকাল। পেশীতে ঢিল

পড়ল, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ফিরে এল দু'জনেই। 'কি চাই তোমার?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

লোকটা প্রস্তাব দিল, মহুয়া ও লীনা ফিরে গিয়ে শহীদকে একটা সহজপাচ্য গল্প শোনাবে। গল্পটা হলো–একটা সূত্র পেয়ে কামালের খোঁজে মিশর ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়েছে রাসেল, সম্ভবত জিম্বাবুয়ে যাচ্ছে সে। 'আমরা চাই,' প্রস্তাবটা দেয়ার পর ব্যাখ্যা করল লোকটা, 'মি. শহীদ মরীচিকার পিছনে ছুটুক।'

লীনার দিকে ফিরে মাথা নাড়ল মহুয়া। 'তোমার ভাই এই গল্প বিশ্বাসই করবে না।'

'অসম্ভব!' মহুয়াকে সমর্থন করল লীনা।

লোকটা হাসল। 'আমার সব কথা আগে শোনো তোমরা। মি. শহীদ যাতে গল্পটা বিশ্বাস করে তার ব্যবস্থা আমরাই করব। সত্যি কথা বলতে কি, সব ব্যবস্থা করাই আছে। মি. শহীদ রাসেলের খোঁজে রওনা হবে হেলিওপলিস এয়ারপোর্ট থেকে, ঠিক আছে? ওখানে একজন প্রতক্ষ্যদর্শী পাবে সে, যে রাসেলকে একটা প্লেন চার্টার করতে দেখেছে। তারপর আদ্দিস আবাবা, নাইরোবি এয়ারপোর্টে সাক্ষী পাওয়া যাবে, যারা রাসেলের প্লেনকে ল্যান্ড করতে দেখেছে, রিফুয়েলিঙের পর আবার টেক-অফ করতে দেখেছে...'

'তারমানে আগে থেকেই প্ল্যান করে রেখেছ তোমরা?' মহুয়া তার বিস্ময় গোপন করতে পারল না।

লোকটা হাসল, জবাব দিল না।

লীনা বলল, 'যেভাবেই প্ল্যান করো, শহীদ ভাই কখনোই বোকার মত একটা মরীচিকার পিছনে ছুটবে না।'

'ঠিক। সেজন্যেই এখানে সেখানে রাসেলের কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে রাখব আমরা। এই যেমন, মি. শহীদ কোথাও পাবে তার হস্তাক্ষর,

কোথাও পাবে তার ফেলে যাওয়া সানগ্লাস বা রুমাল।'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল মহুয়ার। 'রাসেল তাহলে সত্যি বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তোমাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে, এই আশায়। বুঝতেই পারছ, তোমরা সহযোগিতা না করলে তাকে মেরে ফেলা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই।'

'রাসেল যে তোমাদের হাতে বন্দী, তার প্রমাণ কি?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

'মীনাকে চীনা খুব আদরযত্ন করবে–এই কথাটার কোন তাৎপর্য আছে কিনা তোমরাই বলো। রাসেল বলল, তোমরা নাকি এর তাৎপর্য ঠিকই বুঝতে পারবে।'

এর অর্থ হলো, ওরা সত্যি সত্যি রাসেলকে বন্দী করেছে। মীনা হলো লীনার পোষা বিড়াল, ঢাকা ছাড়ার আগে সে তার বান্ধবী চীনার কাছে রেখে এসেছে মীনাকে। এই খবর রাসেল ছাড়া আর কেউ জানে না।

মহুয়া বলল, 'তুমি একা, আর আমরা এখানে পাঁচজন। এখন যদি তোমাকে আমরা আটক করি, পুলিস ডাকি? তখন কি হবে?'

গোলগাল মোটা লোকটা মাথা নাড়ল। 'সেটা হবে তোমাদের চরম বোকামি। বিশাল লেকে আমি একটা খুদে মাছ। আমাকে আটক করলে বা পুলিসের হাতে তুলে দিলে তোমাদের কোন লাভ নেই। আমি শুধুই একজন বার্তাবাহক। আরও পরিষ্কার করে বলি, আমি ওদের নওকর। ওরা জানে তোমরা আমাকে আটক করতে পারো।'

'তুমি যদি চাকরই হবে, গলায় আর আঙুলে এত সোনা পরেছ কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া। লোকটা জবাব দেয়ার আগেই লীনাকে ইঙ্গিত করল সে, পরমুহূর্তে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল

দু'জন। লীনা লোকটার হাত দুটো চেপে ধরল, মহুয়া দ্রুত সার্চ করল আলখেল্লার ভেতরটা। আধ মিনিট পর তাকে ছেড়ে পিছিয়ে এল ওরা, সার্চ করে কিছুই পায়নি মহুয়া।

ছাড়া পেয়ে হেসে উঠল লোকটা। 'আমাকে তোমরা বোকা ভেবেছ? এরকম একটা কাজে যখন কেউ আসে, তার সঙ্গে কিছু থাকে না।'

'তা না থাক,' বলল মহুয়া। 'তোমাকে কথা বলাবার কৌশল আমাদের জানা আছে।'

'দুঃখিত। কোন তথ্য দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ভাল, লেটেস্ট ট্রুথ সেরাম দেখেছ? একটা ইঞ্জেকশনই যথেষ্ট, গড় গড় করে সব বলে ফেলবে তুমি।'

স্থূলকায় লোকটাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'ইঞ্জেকশন দিলে আমি স্বস্তিবোধ করব না। কিন্তু তাতেও তোমাদের কোন লাভ নেই। কারণ, আমি কিছু জানি না।'

'কি?'

'ভেবে দেখো না, ঘুমোন কি এতই বোকা? আমি যদি গোপন দু'একটা তথ্যও জানতাম, তোমাদের কাছে আমাকে সে পাঠাত?'

চারদিকে অনেক পাথর, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে খসে পড়েছে নদীর কিনারায়, তারই একটার গায়ে হেলান দিল মহুয়া আর লীনা। দু'জনেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেই সঙ্গে ঘামছে। ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে, দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে আধখানা চাঁদ।

'তোমাদের সত্যি খুব বিপদ,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল মারিয়ো পেত্রা।

যেন হঠাৎ খেয়াল হতে পেত্রা, টাটা আর ডোনার দিকে তাকাল মোটা লোকটা। 'তোমাদের জন্যেও একটা মেসেজ আছে আমার কাছে। মেসেজ মানে উপদেশ। শুনতে চাও?'

'বলে ফেলো,' বলল পেত্রা। 'নিশ্চয়ই ভাল কিছু নয়।'

'ঠিক উল্টো, অর্থাৎ সৎ পরামর্শ,' লোকটা বলল। 'তোমরা তিনজন ভ্রমণে বেরোও। নীলনদ ধরে উজানে চলে যাও তিন মাসের জন্যে। কিংবা বৈরুতে যাও, এবং সেই সঙ্গে ভুলে যাও এখানে কি ঘটছে।'

টাটার দিকে আঙুল তাক করল পেত্রা। 'আমি বেড়াতে যাব এই কাটখোট্টার সঙ্গে? প্রস্তাবটাই তো আমার জন্যে অপমানজনক।'

টাটা রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকল, রাগে কথা বলতে পারছে না।

মোটা বলল, 'তুমি একা গেলেও যেতে পারো। আসল কথা হলো, এই আগুনটাকে নিয়ে খেলো না তোমরা।'

ডোনা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠল, 'জেফরি আমাদের বন্ধু ছিল। বন্ধুদের খুন করে বলা হবে ভুলে যাও, এ আমরা মেনে নিতে পারি না!'

মোটা বলল, 'সে তোমাদের ইচ্ছে। আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে, বললাম।'

মহুয়া আর লীনা হঠাৎ একপাশে সরে গেল, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। 'তোমার ভাইকে কখনও আমি মিথ্যে কথা বলিনি,' লীনাকে বলল মহুয়া।

'আমরা যদি শহীদ ভাইকে গল্পটা না বলি, ওরা কি রাসেলকে খুন করবে?'

'কি জানি। তোমার কি মনে হয়?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে লীনা বলল, 'রাসেল যেহেতু ওদের হাতে বন্দী, ঝুঁকি নেয়াটা ঠিক হবে না, ভাবী। শহীদ ভাইকে মিথ্যে কথাই বলতে হবে আমাদের।'

ওরা আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল।

মোটা লোকটা বলল, 'একা শুধু রাসেলের কথা নয়, মি. শহীদের কথাও ভাবতে হবে তোমাদের। ভুল বুঝিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিলে তারও মস্ত উপকার করা হবে–সে-ও বেঁচে থাকবে।'

মহুয়া বিড়বিড় করল, 'ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্যে আরও সময় দরকার আমাদের।'

লোকটা ওদের দিকে পিছন ফিরল। 'তাহলে পরে আসব আমি।'

'এক মিনিট! আমাদের সিদ্ধান্ত তোমাকে জানাব কিভাবে? কোথায় পাব তোমাকে?'

'আমিই তোমাদের খুঁজে নেব, চিন্তা কোরো না,' বলল লোকটা, দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

কিন্তু এক মিনিটও পার হয়নি, হাসতে হাসতে ফিরে এল সে। 'ও, ভুল হয়ে গেছে, আসল কথাটাই বলা হয়নি। তোমাদের বন্ধু, মি. কামাল। তাকে তোমরা বহাল তবিয়তে ফেরত পাবে, সহযোগিতা করার বিনিময়ে।'

দ্বিতীয়বার অদৃশ্য হলো লোকটা, এবার আর ফিরল না।

ছয়

এজবেকিয়া গার্ডেনের উল্টোদিকে, ফাইভ স্টার ব্লু নাইলে ফিরে এল শহীদ। মহুয়া ও লীনাকে নিয়ে রাসেল ফেরেনি, হোটেলের রিসেপশনে কোন মেসেজও পাঠায়নি সে। চিন্তিত হয়ে পড়ল

শহীদ। আরও ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর কায়রো মেট্রোপলিটান পুলিসের হেডকোয়ার্টারে ফোন করল, অনুরোধ করল শহরের সবখানে যেন খোঁজা হয় ওদেরকে।

সকালে হোটেলের রেস্তোরাঁয় নাস্তা খেয়ে বেরিয়েছিল, তারপর থেকে পেটে কিছু পড়েনি। শাওয়ার সেরে, কাপড় পাল্টে, হোটেলের ডাইনিং রুমে নামল শহীদ। হেড ওয়েটারকে বকশিশ দেয়ায় কোণার একটা টেবিল পাওয়া গেল, খুদে ফোয়ারা আর কৃত্রিম রঙবেরঙের ঝোপ বাকি টেবিল থেকে ওটাকে আড়াল করে রেখেছে। ডেস্কে খবর পাঠাল কেউ খোঁজ করলে কোথায় ওকে পাওয়া যাবে।

মেন্যু দেখে 'ফিশ গার্ডেন'-এর অর্ডার দিল শহীদ। ওয়েটার প্রচুর ভেজিটেবল সহ সীফুড পরিবেশন করল। খাওয়া মাত্র শুরু করেছে, এই সময় হাজির হলো মহুয়া আর লীনা। ওরা কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে নিষেধ করল শহীদ, ওয়েটারকে ডেকে ওদেরকেও ডিনার পরিবেশন করার নির্দেশ দিল। ওয়েটার চলে যাবার পর জানতে চাইল, 'রাসেল কোথায়?'

মহুয়াকে কেমন অস্থির লাগছে। প্রথমে এক ঢোক পানি খেয়ে ঠাণ্ডা হলো সে, তারপর মুখ খুলল। বানানো গল্পটা অর্ধেকও বলা হয়নি, একজন ওয়েটার এগিয়ে এসে শহীদকে জানাল, 'মি. শহীদ, আপনার ফোন। কোত্থেকে কথা বলবেন—এখান থেকে, নাকি ডেস্ক থেকে, স্যার, প্লীজ?'

'এখুনি আসছি,' বলে টেবিল ছাড়ল শহীদ, ওয়েটারের পিছু নিয়ে চলে গেল।

লীনাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে। শহীদ চলে যেতেই বিড়বিড় করে বলল, 'শহীদ ভাই আমাদের কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।'

'যেভাবে হোক বিশ্বাস করাতেই হবে,' মহুয়াও ফিসফিস

করছে। 'তা না হলে রাসেলকে বাঁচানো যাবে না।'

'হ্যাঁ।'

খানিক পর টেবিলে ফিরে এসে শহীদ বলল, 'কায়রো পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের চীফ ফোন করেছিলেন। আমাদের জন্যে বিশেষ ছাড়পত্র পাঠাচ্ছেন তিনি, ওগুলো সঙ্গে থাকলে মিশরের যে-কোন জায়গায় যেতে পারব আমরা, এমন কি প্রয়োজনে সীমান্ত পেরিয়ে অন্য কোন দেশ থেকেও ঘুরে আসতে পারব।' মহুয়া আর লীনার দিকে পালা করে তাকাল ও। 'কি ব্যাপার বলো তো, মহুয়া? তোমাদের দু'জনকে পাথরের মূর্তি মনে হচ্ছে কেন? রাসেলের কিছু হয়েছে নাকি?'

প্রবলবেগে মাথা নেড়ে গল্পটা আবার শুরু করল মহুয়া।

সব শুনে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল শহীদ। 'কামাল কোথায় আছে, এটা জানতে পেরে জিম্বাবুইয়ে চলে গেল রাসেল, আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিল না?'

'কি করে খবর দেবে, সময় পেল কোথায়,' তাড়াতাড়ি বলল লীনা। 'ও চার্টার করা প্লেন নিয়ে তিনজনের দলটার পিছু নিল, অমনি আমরাও তোমার কাছে ছুটে এলাম...'

'এখন তাহলে আমাদের উচিত রাসেলের পিছু নেয়া, তাই না?' জিজ্ঞেস করল শহীদ।

মহুয়া আর লীনা চোরা চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল। মহুয়া বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

মহুয়া নিজেদের স্যুইটে চলে গেল, লীনা ঢুকল তার কামরায়, জিম্বাবুইয়ে সফরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে। শহীদ নিচতলায় থেকে গেল, বলল ট্র্যাভেল অফিসে ফোন করে প্লেন চার্টার করতে হবে ওকে।

একটা অ্যামফিবিয়ান প্লেন পাওয়া গেল, ডাঙায় ছাড়াও

পানিতে ল্যান্ড করতে পারে। এঞ্জিনের শক্তি পাঁচ হাজার হর্সপাওয়ার, প্রেসার ইকুইপড্ কেবিন।

ব্যাগ গুছিয়ে ভাই-ভাবীর স্যুইটে চলে এল লীনা, কামাল ও রাসেলের চিন্তায় মনটা বিষণ্ন হয়ে আছে। তাকে দেখে মহুয়া ফিসফিস করে বলল, 'মোটা লোকটা কখন দেখা দেবে কে জানে।'

স্যুইটের দরজা বন্ধ করে একটা সোফায় ধপ করে বসে পড়ল লীনা। 'ভাবী, আমার কিন্তু সাংঘাতিক ভয় করছে। কাজটা কি আমরা ভাল করছি?'

মহুয়া কিছু বলার আগেই দরজায় নক হলো। 'রুম সার্ভিস, ম্যাডাম। আপনার কফি।'

মহুয়া দরজা খুলতেই চাকা লাগানো ট্রলি নিয়ে স্যুইটে ঢুকল সেই মোটা লোকটা, পরনে ওয়েট রের ইউনিফর্ম। 'তোমরা একা তো?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

'গুড। কি সিদ্ধান্ত নিলে বলো।'

'মি. শহীদকে আমরা বলেছি রাসেল তিনজনকে অনুসরণ করছে,' বলল মহুয়া। 'তিনজন হলো–টাটা, পেত্রা আর ডোনা। বলেছি ওরা জিম্বাবুইয়ে যাবে।'

লোকটা গম্ভীর হলো। 'টাটা, পেত্রা আর ডোনাকে এর মধ্যে না জড়ালেই ভাল করতে।'

'এছাড়া কোন উপায় ছিল না,' বলল মহুয়া। 'মি. শহীদ ঘটনাটা যদি চেক করেন, গল্পটায় খানিক বাস্তব ভিত্তি অন্তত পাবেন।'

'বলে যখন ফেলেছ, এখন আর করার কিছু নেই,' বলল লোকটা। ওদের দু'জনকে তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল সে। 'বিপদে পড়লে রাসেল কি কোন সঙ্কেত রেখে যাবে? সেরকম কোন ব্যবস্থা আগে থেকে করা আছে? যদি থাকে, কি ধরনের সঙ্কেত বা

সূত্র রেখে যাবে সে?'

মাথা নেড়ে মহুয়া বলল, 'রাসেল কোন সঙ্কেত দেবে না। আমি বলতে চাইছি, আগে থেকে ঠিক করা কোন পাসওয়ার্ড নেই। সূত্র রেখে যাবে অন্য এক কৌশলে।'

'কি কৌশলে?'

'যেখানেই যাক রাসেল, সুযোগ পেলেই ডাকটিকেট কিনবে,' বলল মহুয়া। 'শুধু যেগুলোয় প্রাকৃতিক দৃশ্য আছে, সেগুলো–নতুন ও পুরানো।'

'ভেরি গুড। আমরা ব্যবস্থা করব, মি. শহীদ যাতে রাসেলের ফেলে যাওয়া সূত্র ঠিকমত পেতে থাকেন,' বলে দরজার দিকে পিছু হটতে শুরু করল লোকটা।

'থামো!' কঠিন সুরে বলল মহুয়া। 'রাসেল আর কামাল সম্পর্কে কিছু না বলেই চলে যাচ্ছ যে?'

'তোমরা জিম্বাবুইয়ে পৌঁছাও, ওখানে তোমাদেরকে বোনাস হিসেবে উপহার দেয়া হবে–রাসেলকে, কামালকেও।' শিস দিতে দিতে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

একটু পরই নিজেদের স্যুইটে হাজির হলো শহীদ। এত তাড়াতাড়ি ওকে আশা করেনি ওরা, তাই রীতিমত চমকে উঠল। শহীদের বগলের তলায় বড় একটা খাতা দেখা যাচ্ছে। 'তোমরা এটায় একবার চোখ বোলাতে পারো, মহুয়া,' বলল ও। খাতাটা টেবিলে রেখে আবার দরজা খুলে স্যুইট ছেড়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত।

'ভাবী! কি ব্যাপার বলো তো?' লীনা ফিসফিস করল। 'শহীদ ভাইকে এমন রহস্যময় লাগছে কেন?'

মহুয়া ভুরু কুঁচকে খাতাটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এটা কি?'

খাতাটার কাভারে চোখ বোলাল লীনা। তাতে লেখা

রয়েছে–'কায়রো পুলিস ডিপার্টমেন্ট'। ভাবী আর ননদ পাশাপাশি বসে খাতাটা খুলল। হঠাৎ একটা লেখার দিকে আঙুল তুলল মহুয়া। 'দেখো!'

'ঘুমোন গ্রুপের চিহ্নিত সদস্যদের তালিকা'।

আরও পাতা ওল্টাল ওরা। 'ভাবী! কি সাংঘাতিক!'

নতুন পাতায় একজন লোকের ছবি সাঁটা রয়েছে। এ সেই মোটা লোক।

তার নাম থিয়োডর মোয়াসাস। লোকটা গ্রীক, বিভিন্ন অপরাধে গ্রীসে তিন দফা জেল খেটে পালিয়ে আসে মিশরে, পেশা হিসেবে বেছে নেয় প্রতারণা। বর্তমানে ঘুমোনের হয়ে কাজ করছে।

খাতাটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল লীনা। 'এটা কায়রো পুলিস দিয়েছে, শহীদ ভাই যাতে ঘুমোন গ্রুপের সদস্যদের চিনতে পারে।'

'আড়াল থেকে নিশ্চয়ই তোমার ভাই লোকটাকে দেখেছে, আমাদের স্যুইটে ঢোকার সময় কিংবা বেরিয়ে যাবার সময়,' বলল মহুয়া।

'সম্ভবত,' বিড়বিড় করল লীনা।

'দেখলে না তোমার ভাই কি রকম ব্যস্তভাবে চলে গেল! নিশ্চয়ই মোটকুর পিছু নিয়েছে।' ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করল মহুয়া, মট মট করে আঙুল মটকাচ্ছে। 'এখন আমার টাটা, পেত্রা আর ডোনাকেও সন্দেহ হচ্ছে। কে জানে ওদের আসল পরিচয় কি...'

আশঙ্কাটা দু'জনের মনে একই সঙ্গে জাগল, ফলে বিছানার ওপর পড়ে থাকা খাতাটার দিকে হাত বাড়াল একযোগে। আবার খাতার ওপর ঝুঁকল ওরা, পাতা ওল্টাল। একে একে অনেকগুলো নাম পাওয়া গেল, ছবি সহ। কিন্তু তালিকায় ওদের তিনজন নেই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিধে হলো ওরা।

'তোমার ভাইকে আমরা বোকা বানাতে পারিনি,' বলল মহুয়া। 'আমরা যে মিথ্যে গল্প শুনিয়েছি, শহীদ তা জানে।'

'কিন্তু শত্রুরা মনে করবে আমরাই শহীদ ভাইকে আসল কথা বলে দিয়েছি। এখন যদি ওরা রাসেলের কোন ক্ষতি করে বসে, ঠেকাবার কোন উপায় নেই।'

প্যালেস আতাবেহ্ ট্যুরিস্ট বাসে চড়ে রওনা হলো থিয়োডর মোয়াসাস। পথের এক জায়গায় নেমে হাঁটা ধরল সে, যাচ্ছে মোকাত্তাম পাহাড়ী এলাকার দিকে। হাঁটার মধ্যে ব্যস্ত কোন ভাব্ নেই, ফুটপাথে সাজানো পসরা দেখার ভান করে মাঝে মধ্যে থামছে, চোখ বোলাচ্ছে চারদিকে। আসলে দেখে নিচ্ছে কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা।

মোয়াসাস জানে না, মহুয়া আর লীনা হোটেলে ফেরার আগেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান পুলিসের পাঠানো খাতায় চোখ বুলিয়ে তার ফটোটা মনে গেঁথে নিয়েছিল। মোয়াসাস হোটেলে ঢুকেছে মহুয়া আর লীনার পিছু নিয়ে, সেটা অবশ্য শহীদের জানার কথা নয়, কারণ সে-সময় ডিনার খাচ্ছিল ও। একটু পর যখন ফোন ধরতে যায়, তখনই মোয়াসাসকে দেখে চিনে ফেলে–লোকটা তখন ডেস্কে দাঁড়িয়ে ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করছিল প্যালেস আতাবেহ্ ট্যুরিস্ট বাস কখন ছাড়বে। মোয়াসাসের পরনে ওয়েটারের ইউনিফর্ম থাকায় শহীদ বুঝতে পারে হোটেলে তার কোন সহযোগী আছে। সেই থেকে লোকটার ওপর নজর রাখছিল ও। সেজন্যেই মহুয়ার সঙ্গে নিজেদের স্যুইটে যায়নি। মহুয়া আর লীনা যে রাসেল সম্পর্কে ওকে ভুল তথ্য দিচ্ছে, এটা আগেই সন্দেহ হয়েছিল ওর। সেটা আরও দৃঢ় হলো মোয়াসাসকে ট্রলি নিয়ে ওদের স্যুইটে ঢুকতে দেখে।

ওদের স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে ইউনিফর্ম খুলে ফেলে মোয়াসাস, তারপর সোজা হোটেলের সামনে থেকে ট্যুরিস্ট বাসে চড়ে। আগেই একটা ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছিল শহীদ, বাসটাকে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হয়নি। সমস্যা দেখা দিল মোয়াসাস হাঁটতে শুরু করার পর। মাঝে মধ্যেই থামছে সে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে। শহীদকে নিশ্চয়ই চেনে সে, কাজেই দেখে ফেললে সব ভেস্তে যাবে।

এক সুযোগে ফুটপাথের দোকান থেকে সাদা একটা আলখেল্লা কিনল শহীদ, স্যুটের ওপর সেটা চাপিয়ে চোখে পরল গাঢ় সানগ্লাস। সাবধানের মার নেই, লোকজনের দেখাদেখি একটা গাধা ভাড়া নিল। গাধাটা অলস, দু'পা এগোয় তো এক পা পিছায়। এতে বরং সুবিধেই হলো শহীদের, কারণ মোয়াসাসও অলস পায়ে হাঁটছে। কিন্তু আরোহী সহ একটা গাধা সারাক্ষণ পিছু লেগে থাকলে তার সন্দেহ হতে পারে, তাই ওটাকে বাদ দিয়ে একটা উটের পিঠে চড়ল শহীদ। এদিকে গাধা কম, উটের সংখ্যা বেশি, ফলে কারও সন্দেহ করার কিছু নেই।

এভাবে মাইল তিনেক এগোবার পর মোকাত্তাম পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম কাঁধের নিচে পৌঁছাল মোয়াসাস। আশপাশে বাড়ি-ঘর কম নয়, তবে কোনটাই গায়ে গায়ে লেগে নেই। গেট পেরিয়ে একটা বাড়ির উঠানে ঢুকল সে। কয়েকবার নক করল, অপেক্ষা করার সময় ঝুঁকে পা চুলকাল, ঠোঁটের নড়া দেখে মনে হলো কোড বা পাসওয়ার্ড উচ্চারণ করল। অবশেষে দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করল মোয়াসাস।

শহীদ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

পনেরো মিনিট পর স্যুট পরা এক লোক বেরুল, ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে হন হন করে হেঁটে চলে গেল চোখের আড়ালে। দরজা আবার ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। আরও পাঁচ-সাত মিনিট

কাটল। স্যুট পরা লোকটা ফিরে এল একটা কার নিয়ে। গাড়িটার পিছনে দুই চাকার একটা ট্রেইলার। কার ও ট্রেইলার থামল বাড়ির এক পাশের একটা দরজার সামনে। লোকটা বারবার বাড়ির ভেতর ঢুকে সুটকেস আর ব্যাগ নিয়ে আসছে, দেখতে দেখতে ট্রেইলারটা ভরে উঠল। একটু পর মোয়াসাসও বেরুল, মুখে চুরুট গুঁজে ট্রেইলারে মালপত্র তোলা দেখছে। কাজটা শেষ হতে স্যুট পরা লোকটা ট্রেইলারের ওপর একটা ক্যানভাস চাপাল। গাড়ি চলার সময় ক্যানভাস বাতাসে উড়ে যেতে পারে, তাই রশি দিয়ে ট্রেইলারের সঙ্গে বাঁধা হলো সেটাকে। এরপর দু'জনেই তারা আবার বাড়ির ভেতর ঢুকল।

এটাই শেষ সুযোগ, বুঝতে পেরে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শহীদ। ক্যানভাস উঁচু করে ভেতরে ঢুকতে কোন সমস্যা হলো না। বাক্স, সুটকেস আর বস্তার মাঝখানে জায়গা করে নিল ও, ক্যানভাসটা টেনে আবার জায়গা মত বসাল।

খানিক পর গোটা দলটা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। স্যুট পরা লোকটা ছাড়াও আরও তিনজন রয়েছে মোয়াসাসের সঙ্গে। সবাই তারা কার-এ চড়ল। ট্রেইলার সহ রওনা হলো কার।

ঝাঁকি খেতে খেতে বিশ মিনিট ছুটল কার, তারপর থামল। কার থেকে ভেসে আসা নতুন একটা গলা ঢুকল শহীদের কানে। 'আমি এর কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না, মোয়াসাস। কি এমন ঘটেছে যে এত ভয় পাচ্ছ তুমি?'

'এই শহীদ খান সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই,' বলল মোয়াসাস। 'সে কায়রোয় আসার পর থেকে আমার আরাম হারাম হয়ে গেছে।'

'এ-কথা তুমি কুয়াশা সম্পর্কেও বলেছিলে,' নতুন লোকটা অভিযোগের সুরে বলল। 'কুয়াশা একটা মূর্তিমান আতঙ্ক, কুয়াশা আমাদেরকে নরকে পাঠাবে, এ-সব কথা বলে সবাইকে একেবারে

অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তারপর সবাই বলাবলি করতে লাগল, কুয়াশাই নাকি ঘুমোন! এখন আবার বলছ, শহীদ খানই আমাদের জন্যে সবচেয়ে বড় বিপদ।'

'ঠিকই বলছি,' ভারী গলায় বলল মোয়াসাস। 'কারণ কুয়াশা আর শহীদ খানকে আমি আলাদাভাবে দেখতে রাজি নই। আমার দৃষ্টিতে কুয়াশা যদি গোক্ষুর হয়, শহীদ খান তাহলে কাঁকড়া বিছে–দুটোর বিষই মারাত্মক। আর এটা তোমার ভুল ধারণা–নিশ্চিতভাবে কখনোই জানা যায়নি যে কুয়াশাই ঘুমোন।'

'কিন্তু শহীদ খানকে যদি বোকা বানিয়ে জিম্বাবুইয়ে পাঠিয়ে থাকো...'

'আমার এই চালাকি ধরতে কতক্ষণ লাগবে তার?' জিজ্ঞেস করল মোয়াসাস। 'একদিন? বড় জোর দু'দিন? তারপরই তো আবার কায়রোয় ফিরে আসবে সে। কাজেই নিরাপদ জায়গায় সরে না গিয়ে উপায় নেই আমাদের।'

আরেকজন লোক মোয়াসাকে সমর্থন করে বলল, 'তারপর, কায়রোয় ফিরে শহীদ খান যখন দেখবে যে আমরা কামাল ও রাসেলকে ছাড়ছি না, একেবারে পাগলা কুকুর হয়ে উঠবে...'

'আমি বলি কি, কামাল আর রাসেলকে ফিরে পেলে শহীদ খান হয়তো দলবল নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যেত।'

'প্রশ্নই ওঠে না!' কঠিন সুরে বলল মোয়াসাস। 'কারণটা তুমি জানো।'

কার থেমেছিল পেট্রল নেয়ার জন্যে। আবার রওনা হয়ে ছোট কয়েকটা শহর পার হয়ে এল ওরা। তারপর পড়ল হাইওয়েতে। স্পীড এখন খুব বেশি। বাতাসের গন্ধ বদলে যাওয়ায় শহীদ বুঝতে পারল নীলনদ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে ওরা। এক সময় হাইওয়ে ছেড়ে মরুভূমিতে চলে এল কার। বালির ওপর দিয়ে ট্রেইলার নিয়ে ছুটছে, গতি একেবারেই মন্থর।

তারপর ওরা আবার থামল। কেউ একজন বলল, 'আশা করা যায় তোমার বেদুইন ভায়েরা খাবারদাবার তৈরি করেই রেখেছে।'

'তাই তো রাখার কথা,' জবাব দিল আরেকজন।

রাতের অন্ধকারে ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। ইতিমধ্যে ট্রেইলার থেকে নেমে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে শহীদ।

ট্রেইলার থেকে নেমে শহীদ দেখল পাথুরে একটা জায়গায় থেমেছে ওরা। ঝড়-ঝঞ্ঝার মরশুম, আকাশে মেঘও করেছে, দূর দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। যে-কোন মুহূর্তে লু হাওয়া বইতে শুরু করবে।

সামনের দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি দুটো বিল্ডিং দেখতে পেল শহীদ, দুটোই একতলা। বাড়িগুলোর পিছনে আরও একটা পরিচিত কাঠামোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে, আংশিক ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। জোড়া বাড়ি আর ক্যানভাস ঢাকা কাঠামোটা বিশাল এক পাহাড়-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসা ঝুল-পাথরের নিচে। ওর দক্ষিণে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, আরেকটা পাহাড়-প্রাচীর; বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওরা একটা খাদের শুকনো তলায় রয়েছে। বিল্ডিং দুটোর ভেতর আলো জ্বললেও, প্রতিটি জানালায় মোটা কাপড়ের পর্দা থাকায় ভেতরের কিছু দেখা যাচ্ছে না।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হাঁটছে শহীদ। ক্যানভাসে ঢাকা পরিচিত কাঠামোটাই প্রথমে পরীক্ষা করল ও। যা ভেবেছিল, তাই। ক্যানভাসের নিচে এটা একটা প্লেন। ছোট আকৃতির প্লেন, খুব বেশি হলে চার হাজার পাউন্ড বোঝা বহন করতে পারবে।

এরপর সাবধানে প্রথম বিল্ডিংটা পরীক্ষা করল শহীদ। জানালার পর্দা বাইরে থেকে সামান্য সরিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাতে দেখল একটা টেবিলে খেতে বসেছে ওরা। সব মিলিয়ে দশজন লোক, খেতে বসা সত্ত্বেও সবার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে।

আরও একজন লোক ঢুকল ঘরে, এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল বাইরে। এগারোজনের মধ্যে ছয়জনকেই চিনতে পারল শহীদ, পুলিসের পাঠানো খাতায় এদের ফটো দেখেছে। এদের মধ্যে ঘুমোন আছে কিনা জানা দরকার।

কান পাতল শহীদ। অস্পষ্ট হলেও কে কি বলছে শোনা যাচ্ছে।

না, ওদের মধ্যে ঘুমোন নেই। তবে নতুন একটা তথ্য পাওয়া গেল। ওরা শুধু ওকে নয়, বা ওকে আর কুয়াশাকে নয়, অন্য একটা কিছুকেও সাংঘাতিক ভয় পাচ্ছে। কায়রো ও মিশর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবার প্ল্যান করছে ওরা, তবে ভয় পাচ্ছে সেখানে সানহারা থাকবে। এই সানহারা কে বা কি, বোঝা গেল না। তামামা আর জেফরির হত্যাকাণ্ড নিয়েও আলোচনা হলো। ওরা দু'জন ঘুমোন গ্রুপের সদস্য ছিল। ওদের মৃত্যু সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

'আজকের দুটো খুন ধরে,' বলল মোয়াসাস, 'চোদ্দজন হলো।'

কেউ একজন বিড়বিড় করল, 'এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে দলের লোকজনকে বেছে বেছে খুন করা হচ্ছে।'

সে থামতেই আরেক লোক ফারাও জুব্বাহ নেদের চোদ্দগুষ্টিকে অভিশাপ দিতে শুরু করল।

মোয়াসাস হেসে উঠলেও, শহীদের কানে বেসুরো শোনাল আওয়াজটা। 'তোমরা কি সত্যি বিশ্বাস করো যে ফারাও জুব্বাহ নেদের আত্মা এ-সবের জন্যে দায়ী?'

এক লোক চড়া গলায় শুরু করল, 'অবশ্যই ফারাও নেদকে দায়ী করি আমরা! কারণ আমরা যারা তাঁর কবরটা খুলেছিলাম শুধু তাদের মধ্যে থেকে লোকজন খুন হচ্ছে। সমাধি লুঠ করার সঙ্গে অবশ্যই এই খুন-খারাবির একটা যোগাযোগ আছে...'

তাকে বাধা দিয়ে মোয়াসাস বলল, 'কবর খোলা, সমাধি লুঠ ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলার আগে আরও সাবধান হওয়া উচিত আমাদের।'

'কেন?'

'তোমরা চাও সানহারারা এ-সব কথা জানুক?'

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

খাওয়া শেষ হতে মোয়াসাসের নির্দেশে এক লোক একটা আলমিরা খুলে চার্ট বের করল। একটা প্যারালাল রুলার দিয়ে মাপজোক নিচ্ছে ওরা, নিজেদের বর্তমান ও পরবর্তী গন্তব্যের অবস্থান চিহ্নিত করছে। ওদের কথা থেকে জানা গেল, আরও এক সেট চার্ট আছে প্লেনে, সেটায় এরইমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে কোর্স।

বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় উৎকট দুর্গন্ধ ঢুকল শহীদের নাকে। ঝোপের ভেতর মরে পচে আছে একটা ইঁদুর। একটা ডাল ভেঙে ইঁদুরটাকে তুলল ও। কোন দিকে বাতাস বইছে লক্ষ করল, তারপর খোলা একটা জানালার কার্নিসে রাখল ইঁদুরটাকে। একটু পরই দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকগুলো। তাড়াতাড়ি জানালার সামনে থেকে সরে এল শহীদ। সাবধানে এগোচ্ছে ও। খোলা দরজার সামনে পৌঁছুতে মিনিট দুয়েক লেগে গেল। কিন্তু ঘরে ঢোকার পর একেবারে বোকা বনে গেল ও। টেবিলের ওপর চার্টটা নেই।

প্লেন নিয়ে রওনা হলো ওরা আরও আধ ঘণ্টা পর।

এত পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে গেল। মন খারাপ করে ওদের ফেলে যাওয়া কার-এর কাছে চলে এল শহীদ। এখানে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। গাড়িতে বসে আলো জ্বলতেই ড্যাশ বোর্ডে ভাঁজ করা একটা চার্ট দেখতে পেল ও। চার্টের সঙ্গে

একটা ছোট্ট চিরকুট, তাতে লেখা–'চার্টে ডাইরেকশন, বিয়ারিং, দূরত্ব ইত্যাদি সবই পাবে তুমি। রহস্যের সমাধান পেতে হলে ওদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কুয়াশা।'

শহীদের স্যুইটে সোফায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লীনা, তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা আর অভয় দিচ্ছে মহুয়া। এই সময় নক হলো দরজায়। মহুয়া দরজা খোলার জন্যে এগোল। সিধে হয়ে বসে চোখ মুছল লীনা।

স্যুইটে ঢুকল শহীদ। ভাইকে দেখে আরও জোরে কেঁদে উঠল লীনা।

মহুয়া বলল, 'তোমাকে আমরা বাধ্য হয়ে মিথ্যে কথা বলেছি, শহীদ...'

শহীদ হাসিমুখে বলল, 'তাতে কি হয়েছে! আমি তো সবাইকে আগেই বলে দিয়েছিলাম, বিপদে পড়লে যে যার বুদ্ধি মত কাজ করবে। লীনা কাঁদছে কেন?'

'কাঁদছে কামালের জন্যে,' বলল মহুয়া। 'আমরা কি রাসেল আর কামালকে আর দেখতে পাব?'

'আমার ধারণা, ওরা বেঁচে আছে,' বলল শহীদ। 'আর বেঁচে থাকলে ঠিকই ওদেরকে উদ্ধার করব আমরা। লীনা, কাঁদবি না, বোন। কান্না কোন সমস্যার সমাধান এনে দেয় না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। মহুয়া, তুমিও।'

'কেন, কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ঘুমোন গ্যাং কায়রো ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় সেটা পরে শুনো। আমরাও সেখানে যাচ্ছি। তুমি তো ঢাকা ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য ছিলে, প্লেন চালাতে আমাকে সাহায্য করতে পারবে তো?'

মিষ্টি হেসে মহুয়া বলল, 'কেন পারব না, দুশো ঘণ্টারও বেশি প্লেন চালাবার অভিজ্ঞতা আছে আমার।'

সাত

সূর্য ওঠার পর সৌদি আরবের রিয়াদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ফুয়েল নেয়ার জন্যে নামল ওরা। ভিসা আগেই নেয়া হয়েছে, কাস্টমস চেকিং স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, বেশি সময় লাগল না। রাতের অন্ধকারে লোহিত সাগর পার হয়ে এসেছে ওরা। রিয়াদ থেকে আবার রওনা হলো প্লেন, গন্তব্য রুবা আল খালি। এলাকাটা শুধু দুর্গম নয়, কিছু কিছু জায়গা নো ম্যানস ল্যান্ড হিসেবে পরিচিত।

দু'ঘণ্টা পর প্লেন সিধে করে নিল শহীদ। চল্লিশ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ওরা। শহীদ ও মহুয়া চোখে বিনকিউলার সেঁটে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে গত আধ ঘণ্টা ধরে। মহুয়া বসেছে কো-পাইলটের সীটে।

নিচে ঊষর মরুভূমি। কোথাও কোন গাছপালা বা বাড়ি-ঘর চোখে পড়ছে না।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে পিছন দিকে তাকাল শহীদ। একটা সীটে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে লীনা।

'ওদের প্লেন আমি দেখতে পাচ্ছি,' মহুয়ার চিৎকারে চমকে উঠল শহীদ, লীনারও ঘুম ভেঙে গেল।

প্লেনটা প্রায় পাঁচ মাইল নিচে, বিনকিউলারেও খুব ছোট দেখাল। তা-ও একা শুধু মহুয়াই দেখতে পেয়েছে। বিনকিউলার

চোখে আবার যখন তাকাল শহীদ, হতাশায় ছেয়ে গেল ওর মন। 'কোথায়, মহুয়া?'

ম্লান সুরে মহুয়া বলল, 'কি আশ্চর্য! এখন তো আমিও আর দেখতে পাচ্ছি না!'

সীটে নড়েচড়ে বসল লীনা। 'ভাবী, তুমি সম্ভবত ভুল দেখেছ।'

নিচের পাহাড়সারির ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে মাথা নাড়ল শহীদ। 'ভুল দেখা সম্ভব, তবে এমনও হতে পারে যে প্লেনটা ওরা লুকিয়ে ফেলছে।'

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ও। ঘুমোন গ্রুপের প্লেনের চেয়ে ওদের প্লেনের স্পীড প্রায় দ্বিগুণ। প্রথম প্লেনটা সম্ভবত একটু আগে ল্যান্ড করেছে। ল্যান্ড করার পর ওটাকে টো করে কোন পাহাড়ের আড়ালে বা গিরিখাদে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

লীনাও এবার তার বিনকিউলার তুলল চোখে। খুদে পাহাড়গুলো দেখে বিস্মিত হলো সে। 'ওগুলো মোচার মত লাগছে কেন?' জানতে চাইল সে।

'এদিকের সব পাহাড়ই গুরকম,' বলল শহীদ। 'তবে লক্ষ করলে দেখতে পাবে, কিছু কিছু পাহাড়ের চূড়া সমতল, নিকানো উঠানের মত।'

মহুয়া হঠাৎ বলল, 'শহীদ, এদিকে আমি কিছু গাছও দেখতে পাচ্ছি!'

'আমিও,' বলল শহীদ। 'ওদের প্লেনের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে সরে এসেছি আমরা। এখানে কোথাও যদি ল্যান্ড করি, ওরা টের পাবে না।'

ওরা ল্যান্ড করল শক্ত ও সমান মাটিতে, জায়গাটা এককালে একটা লেকের তলা ছিল। শুকনো লেকের পশ্চিম দিকে পাহাড় সারি, ল্যান্ড করার পর ছুটে এসে একজোড়া পাহাড়ের মাঝখানে স্থির হলো প্লেন।

কোদাল হাতে নিচে নামল ওরা। প্লেনের ডানা আর ফিউজিলাজে বালি ফেলে যতটা সম্ভব ঢাকার ব্যবস্থা হলো। দুপুরের পর থেকে ছায়াগুলো লম্বা হবে, তখন আর দূর থেকে দেখেও কেউ প্লেনটাকে চিনতে পারবে না।

মহুয়া খুব ক্লান্ত, কাজটা শেষ হতেই প্লেনে উঠে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ভাইয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলছে লীনা। তার মনে অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতূহল। প্রথমেই সে জানতে চাইল রহস্যময় মৃত্যু সম্পর্কে। এ-সব মৃত্যুর জন্যে নিশ্চয়ই ফারাও জুব্বাহ্ নেদের অভিশাপ দায়ী হতে পারে না। তার মনে পড়ছে, তামামা এই ফারাও সম্পর্কে বলেছিল–'মুক্তিদাতাদের অন্যতম ছিলেন প্রাচীন ফারাও জুব্বাহ্ নেদ।' সে আরও বলেছিল, 'ফারাও জুব্বাহ্ নেদের সমাধি নীলনদের আশপাশে বা দায়ির আল-বাহরি অথবা থিবেস-এর কোথাও পাওয়া যায়নি। আসলে মিশরের কোথাও ওটার হদিশ মেলেনি। বলা হয়, অনেক দূর যাদুর এক দেশে তাঁর সমাধি আছে।'

'এটাই কি সেই যাদুর দেশ, শহীদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল লীনা।

'ফারাও জুব্বাহ্ নেদের অস্তিত্ব সত্যি ছিল,' বলল শহীদ। 'মিশরের প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য আছে। নীলনদ থেকে বহু দূরে কেন তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়, এটা খুব একটা রহস্য নয়। এই ফারাও-এর বংশধর ও প্রজারা রুবা আল খালি ছাড়িয়ে আরও দূরে, ওমানের কোন দুর্গম এলাকায় বসবাস করত বলে শোনা যায়। আজও হয়তো তাদের অস্তিত্ব আছে। আমার ধারণা, জুব্বাহ্ নেদকে এদিকেই কোথাও কবর দেয়া হয়।'

'তাঁর আত্মা অঘটন ঘটাচ্ছে, এটা তুমি বিশ্বাস করো?'

হেসে ফেলল শহীদ। 'কোন আধুনিক মানুষ তা বিশ্বাস করবে

না।'

'তাহলে মানুষ মারা যাচ্ছে কি কারণে?' জিজ্ঞেস করল লীনা।

'নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে,' বলল শহীদ। 'সেই কারণটা জানতেই তো এসেছি আমরা।'

'আর কামাল ভাই ও রাসেল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা, ওরা বেঁচে আছে। কারণ ওরা এমন কিছু করেনি যে ওদেরকে মেরে ফেলতে হবে। আমার আরও ধারণা, দু'জনেই ওরা সানহারাদের হাতে পড়েছে।'

'সানহারা মানে কি?'

'সানহারা শব্দটার আভিধানিক অর্থ আমার জানা নেই,' বলল শহীদ। 'হয়তো কোন অভিধানে শব্দটা পাওয়াও যাবে না। তবে আমার সন্দেহ, সানহারা একটা উপজাতি বা বেদুইন গোষ্ঠির নাম।'

লীনার প্রশ্ন এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু ক্লান্ত শহীদ একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন ঘণ্টা পর, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই, কান ফাটানো কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মহুয়ার। সীটের ওপর সিধে হয়ে বসে বোকার মত এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কানে এখনও শব্দটা লেগে রয়েছে। মনে হলো, কাছাকাছি কোথাও থেকে যেন মেশিন গান চালানো হয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে শহীদ আর লীনাকে দেখতে পেল সে, একটা বোল্ডারের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তাকিয়ে আছে একজোড়া পাহাড়ের দিকে।

দরজা খুলে নিচে নামল মহুয়া। ফাঁকা জায়গাটা ছুটে পার হচ্ছে। এই সময় আবার সেই কান ফাটানো আওয়াজ। সেই সঙ্গে বিশাল একটা ছায়াকে চোখের নিমেষে পাশ কাটাতে দেখল সে।

বোল্ডারের পিছনে এসে লীনার গায়ে আছড়ে পড়ল, জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটছে?'

'মান্ধাতা আমলের একটা প্লেন লেকের ওপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে,' বলল শহীদ। 'সম্ভবত ল্যান্ড করতে চায়।'

'কোন দিক থেকে এল?' হাঁপাচ্ছে মহুয়া।

'উত্তর-পুব থেকে।'

কয়েকটা পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে প্লেনটা, সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল শহীদ। একটু পর আবার সেটাকে দেখা গেল। এঞ্জিন অলস, ল্যান্ডিং ফ্ল্যাপ খুলে যাচ্ছে। সন্দেহ নেই, ল্যান্ড করতে আসছে প্লেনটা। মনে মনে একটা হিসাব করল শহীদ। কোথায় ল্যান্ড করতে পারে, ল্যান্ড করার পর কোথায় স্থির হবে। 'তোমরা আরেক দিক থেকে ঘিরে ফেলবে ওটাকে,' বলেই ছুটল ও।

বোল্ডার আর ঝোপের আড়াল নিয়ে দুশো গজ এগোল শহীদ। হিসাবে কোন ভুল হয়নি, ল্যান্ড করার পর ওর ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ছোট্ট প্লেনটা। ককপিটের জানালায় এক শ্বেতাঙ্গ তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। মহুয়ার দেয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে মেয়েটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। এর নাম ডোনা মিলার। ডোনার সঙ্গে দু'জন পুরুষ সঙ্গী রয়েছে, তবে কে কেমন দেখতে বোঝা গেল না।

শহীদের পরনে আলখেল্লা। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুটবল আকৃতির একটা পাথর কুড়িয়ে আলখেল্লার ভেতর লুকাল ও, তারপর আড়াল থেকে বেরিয়ে প্লেনটার দিকে এগোল। প্লেনের কাছাকাছি এসে খালি হাতটা তুলে অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে নাড়ল। প্লেনের জানালায় এখন তিনজনের মুখই দেখা যাচ্ছে। হাসি হাসি মুখ, বন্ধুভাবাপন্ন।

প্লেনের এঞ্জিন এখনও সচল, নাকের সামনে প্রপেলারটা এত

জোরে ঘুরছে যে ধাতব চাকতির মত লাগছে। আলখেল্লার ভেতর থেকে পাথরটা বের করে প্রপেলার লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল শহীদ। সংঘর্ষের কর্কশ শব্দে রি রি করে উঠল গা। আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে। প্লেনটা বার কয়েক ঝাঁকি খেলো। প্রপেলারের একটা ব্লেড ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পাথরটা ছোঁড়ার পর অপেক্ষা করেনি শহীদ, ছুটে প্লেনের তলায় চলে এসেছে।

কেউ একজন প্লেনের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। তারপর মারিয়ো পেত্রার গলা ভেসে এল। 'ভদ্রলোক সম্ভবত মি. শহীদ খান। কিন্তু উনি আমাদের ওপর খেপে আছেন কি কারণে?'

'মি. শহীদ খান? ঠিক জানো?' জিজ্ঞেস করল ডোনা। 'কিন্তু এতক্ষণ আমার ধারণা ছিল মি. কুয়াশার সামনে পড়ব আমরা!'

ওদেরকে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথা বলতে দিল শহীদ। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'এখন যদি আমি একটা সাবমেশিন গান দিয়ে প্লেনের তলা ফুটো করে দিই, কেমন হবে সেটা?'

প্লেনের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। কয়েক সেকেন্ড পর টাটা জানতে চাইল, 'কি চান আপনি?'

'সঙ্গে অস্ত্র থাকলে সব ফেলে দাও বাইরে। তারপর দরজা খুলে একে একে বেরিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল শহীদ। 'কোন রকম চালাকি করতে দেখলে গুলি করে ফেলে দেব।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল প্লেনের ভেতর।

'তোমাদের হাতে বেশি সময় নেই,' মনে করিয়ে দিল শহীদ।

'ঠিক আছে, বেরুচ্ছি আমরা,' বলল টাটা।

জানালা দিয়ে প্রথমে চারটে স্মল আর্মস ফেলল ওরা। ওগুলোর মধ্যে পাথর বসানো টাটার পিস্তলটাও আছে। প্রথমে সেই নিচে নামল, তার পিছু নিয়ে ডোনা। দু'জনেই মাথার ওপর

হাত তুলে রেখেছে।

শহীদ বলল, 'আরেকজন কোথায়? মারিয়ো পেত্রা?'

'বললেই কি বেরুনো যায়,' প্লেনের ভেতর থেকে পেত্রার গলা ভেসে এল। 'ভেতরে ঢুকে দেখুন আমার কি অবস্থা।'

শহীদ কোন ঝুঁকি না নিয়ে মহুয়া আর লীনাকে ডাকল, তারপর সাবধানে প্লেনের দরজার দিকে এগোল। ভেতরে উঁকি দিয়ে মহুয়া বলল, 'পেত্রাকে বেঁধে রাখা হয়েছে।'

প্লেনে উঠে তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল শহীদ। 'এর মানে কি?' জানতে চাইল ও। 'তুমি কি ওদের বন্দী?'

'বন্দী না হলে এভাবে কেউ কাউকে বেঁধে রাখে?' পাল্টা প্রশ্ন করল পেত্রা। 'তবে প্রায় খুলে এনেছিলাম, আপনি সাহায্য না করলেও মুক্ত হতে পারতাম।'

পেত্রাকে নিয়ে প্লেন থেকে নামল শহীদ। টাটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিই তাহলে টাটাগ্লিয়া এবরাহেম?'

মাথা ঝাঁকাল টাটা। 'কাউন্ট কারডুসি কাপুয়ানা জিয়াপেট্রিও লিওনার্দোনিয়া হোসেফিনি টাটাগ্লিয়া এবরাহেম। হ্যাঁ।'

'হাড়গিলে,' হিসহিস করে বলল পেত্রা। 'এত লম্বা নামের সংক্ষেপ হাড়গিলেই দাঁড়াবে। একবার শুধু তোমাকে কায়দা মত হাতে পেয়ে নিই!'

'ওরে শিয়ালের ভেজা ঠ্যাং, তুই আমাকে কোনকালেই কায়দা মত পাবি না,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল টাটা।

ওদের ব্যক্তিগত ঝগড়াটা সন্দেহের চোখে দেখছে শহীদ। ধমক দিয়ে চুপ করাল দু'জনকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পেত্রা, তোমাকে ওরা বন্দী করল কেন ব্যাখ্যা করো।'

বার কয়েক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বক্তব্য গুছিয়ে নিল পেত্রা, তারপর শুরু করল, 'কাল রাতে কায়রোয় ওরা আমাকে বন্দী করে। হোটেলে একাই ফিরেছিলাম। হঠাৎ ওরা দু'জন হাজির হলো,

হাতে অস্ত্র নিয়ে। কোত্থেকে একটা প্লেন যোগাড় করল জানি না, সেটায় উঠতে বাধ্য করা হলো আমাকে। ওই হাড়গিলেই ওটা চালিয়ে এনেছে।'

'গন্তব্য সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

'বললেও আমি কিছু বুঝিনি। ওরা নিজেরাও আগে এখানে এসেছে বলে মনে হয় না।'

টাটা বলল, 'যাক, এই প্রথম তোমাকে সত্যি কথা বলতে শুনলাম।'

তার দিকে তাকিয়ে শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'ওকে তোমরা কিডন্যাপ করে এনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল শহীদ। লক্ষ করল, ডোনা মিলার নার্ভাস ভঙ্গিতে আঙুল মটাকাচ্ছে।

'কেন? এর উত্তর পাওয়া যাবে চার্ট-বোর্ডে,' বলল টাটা। 'তোমার সঙ্গিনীদের কাউকে বলো, নিয়ে আসুক ওটা।'

'কেন, চার্ট-বোর্ডে কি আছে?'

'আনাও, তাহলেই দেখতে পাবে।'

প্লেনে উঠল লীনা, ছোট একটা কাঠের ড্রইং বোর্ড নিয়ে বেরিয়ে এল একটু পরই। এই বোর্ডেই চার্টটা পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। চার্ট ছাড়াও একটুকরো কাগজ দেখতে পেল সে। তাতে লেখা–

> 'পেত্রাকে আটক করো, তারপর নিয়ে এসো চার্টে
> চিহ্নিত করা জায়গায়, তাহলেই জেফরির খুনীকে
> তোমাদের হাতে তুলে দেয়া হবে–ঘুমোন।'

লেখাটা পড়ে মুখ তুলল শহীদ। 'কোত্থেকে এল এটা?'

ডোনার দিকে তাকাল টাটা। 'তুমিই বলো, ডোনা। আমি বললে ওরা না-ও বিশ্বাস করতে পারে।'

গলা পরিষ্কার করার জন্যে বার কয়েক কাশতে হলো ডোনাকে। 'এটা আমি আমার কায়রো অ্যাপার্টমেন্টে পাই। গতকাল রাতে। টাটা আমাকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেয়। কে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে এই নিয়ে ওর সঙ্গে পেত্রার ঝগড়া হয়। মহুয়া আর লীনা আমাদেরকে রেখে চলে যাবার পরের ঘটনা সেটা। সমস্যার সমাধান হয় টস করে। পেত্রা হেরে যায়। কাজেই আমাকে পৌঁছে দেয় টাটা। ওকে আমি দরজা থেকে বিদায় করে দিয়ে ভেতরে ঢুকি।'

দম নেয়ার জন্যে থামল ডোনা। এখন তাকে আগের চেয়েও নার্ভাস লাগছে।

'লেখাটা আমি ল্যাম্প শেড-এ পিন দিয়ে আটকানো অবস্থায় পাই,' আবার শুরু করল সে। 'পড়েই ছুটে বেরিয়ে আসি বাইরে। টাটা তখনও বেশি দূর যায়নি। পিছন থেকে ডাক দিই আমি, লেখাটা দেখাই। ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করি আমরা। টাটা বলল, চেষ্টা করলে একটা প্লেন চার্টার করতে পারবে সে। পাইলট লাগবে না, কারণ সে প্লেন চালাতে জানে। কাজেই চিরকুটের নির্দেশ মত...'

'কিন্তু ঘুমোন একটা কালপ্রিট। তোমরা পুলিসের কাছে না গিয়ে ঘুমোনের কাছে কেন আসতে চাইলে?'

ডোনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আইডিয়াটা আমার নয়, টাটার। তুমি ওকেই কথাটা জিজ্ঞেস করো।'

টাটাও উত্তর দিতে দেরি করল না। 'পুলিসের দৌড় যে কতদূর, সে তো আমাদের জানাই আছে। একের পর এক এতগুলো খুন হয়ে গেল কায়রোয়, তারা কি একটারও কোন সমাধান করতে পেরেছে? জেফরি আমাদের বন্ধু ছিল, তার খুনীকে যে ভাবে হোক আমরা ধরতে চেয়েছি। ঘুমোনকে চটিয়ে যে কোন লাভ নেই, এই সাধারণ বুদ্ধিটা আমাদের আছে। সে কেমন লোক,

তা জেনে কি লাভ আমাদের? আমাদের দরকার জেফরির খুনীকে।'

মহুয়া বলল, 'এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। শুনে মনে হচ্ছে খোঁড়া অজুহাত।'

'টাটা হচ্ছে চিরকেলে মিথ্যুক!' বলল পেত্রা। 'ওর কথা তোমরা বিশ্বাস করো না।'

'আর তুমি হচ্ছ জাত বেঈমান,' হিসহিস করে বলল টাটা। 'পারলে জবাব দাও তো দেখি, তোমার এত কিসের গুরুত্ব যে তোমার বিনিময়ে একজন খুনীকে আমাদের হাতে তুলে দিতে চাইছে ঘুমোন?'

পেত্রাকে হতভম্ব দেখাল। শহীদের দিকে তাকাল সে। 'ওর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কথাটা কি সত্যি? ঘুমোন তোমাকে চায়?'

'এই ঘুমোন কে; সে আমাকে সত্যি চাইছে কিনা, চাইলে কেন, এ-সব কিছুই আমার জানা নেই।' অসহায় ভঙ্গি করে হাত দুটো দু'দিকে মেলে ধরল পেত্রা। 'ফর গড'স সেক, সত্যি আমার কোন ধারণা নেই। টাটা সম্ভবত মিথ্যে কথা বলছে।'

ডোনা বলল, 'কিন্তু আমি, পেত্রা? আমিও কি মিথ্যে কথা বলছি?'

চমকে উঠে ডোনার দিকে তাকাল পেত্রা। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'না–নাহ্! তুমি মিথ্যে কথা বলবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু তর্কের মীমাংসা হলো না। ওরা তিনজনই যে-যার গল্প আঁকড়ে ধরে থাকল, ভুল হচ্ছে বলে সংশোধন করতে রাজি নয়। ওদের প্লেন থেকে বের করে আনা চার্টটা পরীক্ষা করল শহীদ। ওকে দেয়া কুয়াশার চার্ট আর এটা

হুবহু প্রায় একই রকম দেখতে, তবে গন্তব্য চিহ্নিত করা হয়েছে আলাদা কালি দিয়ে।

ডোনা শুধু আরেকটু যোগ করল—আকাশ থেকে ওদের প্লেনটা দেখতে পায় ওরা, ধরে নেয় এই জায়গাই ওদের গন্তব্য। সেজন্যেই এখানে ল্যান্ড করেছে।

মহুয়া আর লীনাকে নিয়ে খানিক দূরে সরে এল শহীদ। দু'জনেই জানাল, ওদের কারও গল্পই তারা বিশ্বাস করছে না। শহীদ ওর প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করল। চার্টে চিহ্নিত জায়গায় ঘুমোন গ্যাংকে' পেতে হলে প্লেন নিয়ে আবার আকাশে উঠতে হবে, তারপর প্যারাস্যুট নিয়ে নামতে হবে।

লীনা ডোনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ফিরে এল। পেত্রা আশপাশেই ঘুর ঘুর করছে, সুযোগ পেলে টাটাকে শ্লেষাত্মক খোঁচা মারতে ছাড়ছে না। তার প্রতিটি কথায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছে টাটা।

এক সময় বিরক্ত হয়ে শহীদ আর মহুয়ার কাছে চলে এল টাটা। বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পেত্রা আসলে আগের জন্মে নিশ্চয়ই বোবা ছিল, মারা যায় বিয়ে হবার আগেই। সেজন্যেই এ-জন্মে এত বেশি কথা বলছে সে, আর ডোনারও পিছু ছাড়ছে না।'

'এ-ধরনের কৌতুক করার মন-মানসিকতা আমাদের নেই,' কঠিন সুরে বলল মহুয়া।

অপমানটা নিঃশব্দে হজম করল টাটা। ইতিমধ্যে চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে।

হঠাৎ বিনা নোটিশে একটা গুলির শব্দ হলো। একটাই গুলি, কিন্তু তার আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে বারবার ফিরে এল ওদের কাছে। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার পর প্রথমে আরবী ভাষায়, তারপর ইংরেজিতে কে যেন বলল, 'এদিকে এসো! বলছি

এদিকে এসো! পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই!'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল।

কয়েক সেকেন্ড পর অন্ধকার থেকে চেঁচিয়ে উঠল লীনা। 'শহীদ ভাই! সাবধান! আমাদেরকে ওরা ঘিরে ফেলেছে!'

তারপরই আরও কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। প্রতিধ্বনিগুলো আরও জোরাল হয়ে ফিরে আসছে। মাজল ফ্ল্যাশ দেখে নিশ্চিত হলো শহীদ, সত্যি সত্যি ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদেরকে। গুলির ও প্রতিধ্বনির শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে হুঙ্কার ও চিৎকার-চেঁচামেচি। ডোনার আর্তচিৎকার পরিষ্কার চেনা গেল।

ডোনা থামতেই পেত্রার গলা ভেসে এল। 'হেলপ! ওরা আমাদের ধরে ফেলেছে! হেলপ!'

সম্ভবত একটা ঘুসি খেয়ে চুপ করে গেল সে।

টাটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে শহীদ। ডোনার আর্তচিৎকার শুনে ছুটে যাচ্ছিল সে, ল্যাং মেরে তাকে ফেলে দিয়েছে শহীদ। এই মুহূর্তে বালির ওপর শুয়ে আছে দু'জনেই, শহীদের একটা হাত টাটার ঘাড়ের ওপর।

আবার লীনার গলা ভেসে এল। 'শহীদ ভাই! সাবধান...' তাকেও সম্ভবত আঘাত করে থামিয়ে দেয়া হলো।

গোলাগুলি চলছেই। শহীদ আর টাটার কাছাকাছি পাথর ও বালিতে বৃষ্টির মত এসে পড়ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

এক পর্যায়ে টাটা থর থর করে কাঁপতে শুরু করল। 'মি. শহীদ, তুমি আমাকে ধরে রেখে বন্ধুর কাজ করছ। যদি ছেড়ে দিতে, খিঁচে উল্টোদিকে দৌড় দিতাম।'

মহুয়া বলল, 'এরকম গোলাগুলির মধ্যে কে না ভয় পাবে।'

'আমি পালাতে চাই, তোমরা আমার সঙ্গে আসছ?' জানতে চাইল টাটা।

'তোমার সঙ্গে মহুয়া যাবে,' বলল শহীদ। 'মহুয়া, টাটার সঙ্গে

নিরাপদ জায়গায় সরে যাও। সোজা উত্তর দিকে যাবে তোমরা। অন্তত দু'হাজার গজ না গিয়ে থামবে না। লুকাবে হয় কোন শুকনো নালায়, নয়তো বোল্ডারের আড়ালে। ঠিক আছে?'

'আর তুমি?'

'আমার অন্য কাজ আছে,' বলল শহীদ। 'তবে চিন্তা কোরো না, তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে নেব।'

হঠাৎ টাটা সিদ্ধান্ত পাল্টে বলল, 'নাহ্, কাপুরুষের মত পালানো উচিত হবে না। আমি বরং...'

শহীদ বলল, 'কোন তর্ক নয়। মহুয়া, ওকে নিয়ে যাও।'

'এসো,' বলে অন্ধকারে ছুটল মহুয়া। টাটার পাঁজরে কনুই দিয়ে জোরে একটা গুঁতো মারল শহীদ। অগত্যা সে-ও মহুয়ার পিছু নিয়ে ছুটল।

আট

শহীদের নির্দেশ মত দু'হাজার গজ উত্তরে এসে কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে আছে মহুয়া আর টাটা। নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে না মহুয়া, সঙ্গে পিস্তল আছে, প্রয়োজনে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে। এমন কি শহীদের কথা ভেবেও চিন্তিত নয়, জানে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে ও। দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে লীনা। হঠাৎ করে অচেনা একদল লোক ওদের ওপর চড়াও হলো, তুমুল গোলাগুলির কারণে ওরা

সামনে বাড়তে পারল না, ডোনা আর পেত্রার সঙ্গে হারিয়ে গেল লীনা। সে যদি বন্দী হয়ে থাকে, তাকে উদ্ধার করা সহজ কাজ হবে না। কারণ কারা যে শত্রু, কাদের হাতে সে বন্দী হয়েছে, সেটাই তো এখনও পরিষ্কার নয়।

প্রথম কামাল, তারপর রাসেল, এখন আবার লীনা!

বিশ মিনিট হলো এখানে লুকিয়েছে ওরা, ছুটন্ত একটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল মহুয়া। তারপর পরিচিত গলা শোনা গেল, তার নাম ধরে ডাকছে। 'আমি এদিকে, শহীদ,' বলল সে।

বোল্ডারগুলোর আড়ালে, ওদের পাশে চলে এল শহীদ। কিন্তু থামল না, বলল, 'আমার সঙ্গে এসো তোমরা। সাবধান, কোন শব্দ করবে না। ছায়ার ভেতর থাকো, গায়ে যেন চাঁদের আলো না লাগে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল টাটা।

'হামলা করেছিল সানহারারা,' বলল শহীদ। 'আমরা একটা মাত্র দল দেখেছি, তাতে পঞ্চাশজনের মত ছিল। ওরা এখন নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। আমরা ওদেরকে অনুসরণ করব।'

'ওরা হামলা করল কেন?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

'ঘুমোন গ্রুপের প্ররোচনায়,' বলল শহীদ। 'আড়াল থেকে সানহারাদের কথাবার্তা শুনেছি আমি। 'ঘুমোনের গ্রুপটা প্লেন নিয়ে এসে সানহারাদের জানায়, ফারাও জুব্বাহ্ নেদের সমাধিতে হামলা চালাবে কুয়াশা, উদ্দেশ্য সমাধির ভিতর অবশিষ্ট যা কিছু আছে তা লুঠ করা। এ-কথা শুনে সানহারাদের উচিত ছিল সমাধির নিরাপত্তার দিকটায় আরও বেশি মনোযোগ দেয়া। তা হয়তো তারা দিয়েছেও, কিন্তু সেই সঙ্গে চারদিকে স্কাউটিং পার্টি পাঠিয়েছে খবরটা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে।'

মহুয়া বলল, 'তারমানে দাঁড়ায়, সানহারারা ঘুমোন গ্রুপের

কথা বিশ্বাস করেনি।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'লীনার কোন খবর পাওনি?' জিজ্ঞেস করল মহুয়া। 'কিংবা ডোনা আর পেত্রার?'

'ওদের কথা কারও মুখে শুনলাম না,' বলল শহীদ।

'যাক, একটা অন্তত সুখবর শুনলাম,' বলল টাটা। 'ওদেরকে তাহলে বন্দী করতে পারেনি। ওরা পালিয়েছে।'

'ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়,' বলল শহীদ। 'তোমরা সানহারাদের অনুসরণ করবে, আমি ওদের তিনজনের খোঁজে আরেক দিকে যাব।'

টাটাকে হঠাৎ চিন্তিত মনে হলো। 'মি. শহীদ, আপনার ধারণা, ওরা পালাতে পারেনি? ওদের কোন বিপদ হয়েছে?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' অনিশ্চিত সুরে বলল শহীদ।

আরও কিছুক্ষণ ছোটার পর ওদেরকে থামতে বলল শহীদ। 'শোনো!'

রাতের নিস্তব্ধতার ভেতর বহু লোকের পদশব্দ ভেসে এল। একসঙ্গে দলবেঁধে কোথাও যাচ্ছে তারা। দলটা ওরদেরকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোবার পর ওরা তিনজন পিছু নিল। কিছুক্ষণ পরই থামল দলটা। এখানে তারা উট রেখে গিয়েছিল। উটের পিঠে চড়ার সময় কিছু বিশৃংখলার সৃষ্টি হলো। চাঁদের আলোয় সব কিছু অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

মহুয়া বলল, 'এখানে উট রেখে লেকের তলায় নেমেছিল ওরা। অর্থাৎ জানত ওখানে আমরা আছি।'

'আবার এমনও হতে পারে যে ওরা জানে লেকের তলাতেই শুধু ল্যান্ড করতে পারে কোন প্লেন, তাই প্রথমে ওখানেই কুয়াশার খোঁজে গিয়েছিল তারা।'

নিজেদের মধ্যে কয়েক মিনিট কথা বলল সানহারারা। কেউ

একজন ওদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে।

শহীদ বলল, 'ওরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে যাচ্ছে। সেটা সম্ভবত কাছাকাছি কোথাওই হবে।'

'ব্যাপারটা রহস্যময় লাগছে আমার,' বলল মহুয়া। 'তারা জানে আশপাশেই কোথাও আছি আমরা। তাহলে চলে যাচ্ছে কেন?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে শহীদ বলল, 'পিছু নেয়ার সময় সাবধানে থাকবে, মহুয়া।'

'ঠিক আছে,' বলল মহুয়া। 'শহীদ, তুমি কি লীনার খোঁজে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'এখুনি?'

'এখুনি,' ফিসফিস করল শহীদ। পরমুহূর্তে মহুয়া আর ওকে দেখতে পেল না, গাঢ় অন্ধকার যেন গ্রাস করে নিল শহীদকে।

এত উট নেই যে সানহারারা সবাই চড়তে পারবে। বেশ কিছু লোক হেঁটেই রওনা হলো। মনে মনে খুশি হলো মহুয়া, পিছু নিতে অসুবিধে হবে না। তাড়াহুড়োর মধ্যে সঙ্গে কিছু নিতে পারেনি সে, তবে এক ক্যানটিন পানি নিতে ভোলেনি। যদিও মরুভূমিতে এক ক্যানটিন পানি তেমন কোন কাজে আসবে না।

সানহারাদের দুশো গজ পিছনে থাকল ওরা। মহুয়া সাবধান করে দেয়ায় পিছন দিকেও নজর রাখছে টাটা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে হাঁটছে ওরা, তেমন কোন ঘটনা ঘটছে না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে টাটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কাছে অস্ত্র আছে তো, ম্যাডাম?'

'শ্‌শ্‌!' চাপা স্বরে বলল মহুয়া। 'আস্তে কথা বলো!'

'না, মানে, তোমার কাছে অস্ত্র আছে কিনা জানতে চাইছিলাম।'

'হ্যাঁ, আছে,' বলে হাতব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল মহুয়া। তারপরই আঁতকে উঠল সে। 'সর্বনাশ! ব্যাগ তো খালি! পিস্তলটা গেল কোথায়!'

'তারমানে একটাই পিস্তল ছিল তোমার কাছে?' জানতে চাইল টাটা।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই,' বলল কাউন্ট টাটা। 'ওটা এখন আমার কাছে।'

'হোয়াট? কি বলতে চাও তুমি?' দাঁড়িয়ে পড়ল মহুয়া, শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে আসছে।

আরবী ভাষায় চিৎকার করে টাটা বলল, 'শত্রুদের একজন ধরা পড়েছে! কে কোথায় আছ, এদিকে ছুটে এসো! শত্রুদের একজন ধরা পড়েছে!'

আঁতকে উঠে মহুয়া বলল, 'মানে? তুমি আমার সঙ্গে...তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করছ!'

কঠিন সুরে টাটা বলল, 'পালাবার চেষ্টা করো না, মিসেস শহীদ খান। গুলি করে হাঁটু গুঁড়ো করে দেব!'

'শহীদ!' সাহায্যের আশায় চেঁচিয়ে উঠল মহুয়া। তার কান্না পাচ্ছে।

'তোমরা কে কোথায় আছ, ছুটে এসো!' আবার হাঁক ছাড়ল টাটা। 'ধরা পড়েছে! ধরা পড়েছে!'

হঠাৎ করেই ওদেরকে ঘিরে ফেলল সানহারারা। নিঃশব্দ পায়ে এল তারা, ঠিক একদল ভূতের মত। কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, কারও হাতে খাপ খোলা তরোয়াল।

তাদের সঙ্গে দ্রুত আরবী ভাষায় কথা বলছে টাটা। সাংঘাতিক উত্তেজিত সে, আরবীর সঙ্গে ইটালিয়ান দু'একটা শব্দও মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে।

প্রকাণ্ডদেহী একজন সানহারা, মাথায় নল-খাগড়া দিয়ে বোনা ও লাল রঙ করা পাগড়ি, গায়ে বহুরঙা আলখেল্লা, আলখেল্লার গায়ে সোনালি জরি আর পাথর বসানো, বলল, 'আমার নাম ওয়ালি।' তার ইংরেজি শুদ্ধ না হলেও, বোঝা যায়।

'আমার পরিচয়...' শুরু করল মহুয়া, কিন্তু শেষ করতে পারল না।

ওয়ালি ধমক দিয়ে বলল, 'আমাদেরকে তুমি ডাকোনি। যে ডেকেছে তার কথা শুনতে চাই আমরা।' টাটার দিকে তাকাল সে।

টাটা একটা হাত তুলে মহুয়াকে দেখাল। 'মহামান্য ফারাও নেদের সমাধি যারা লুঠ করেছিল তাদের মধ্যে এই মহিলাও ছিল।'

'কি!' আক্ষরিক অর্থেই আকাশ থেকে পড়ল মহুয়া।

মিষ্টি হেসে সবার ওপর চোখ বোলাল টাটা। 'অনেক বুদ্ধি কষে, অনেক পরিশ্রম করে, মরুভূমিতে নিয়ে এসেছি একে–তোমাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে,' ওয়ালিকে বলল সে। 'আমি চাই মহামান্য নেদের অসম্মান করেছে যারা তাদের প্রত্যেকের শাস্তি হোক।'

মহুয়া ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে আল্লাহর কিরে খেয়ে বলল, 'আমি বিদেশী নাগরিক, মিশরে মাত্র কয়েক দিন হলো এসেছি। সমাধি লুঠ করা তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত কোন সমাধি আমার দেখাই হয়নি।'

হো হো করে হেসে উঠল টাটা। তারপর বলল, 'ডাহা মিথ্যে কথা বলছে!'

সম্ভবত মেয়ে বলেই মহুয়ার গায়ে হাত তোলা হলো না। সানহারারা তার শুধু হাত বাঁধল, রশির অপর প্রান্তটা থাকল এক লোকের হাতে, লোকটা উটের ওপর বসে আছে। আবার রওনা

হলো কাফেলা।

তিন ঘণ্টা একনাগাড়ে হাঁটল ওরা। সামনে একটা জঙ্গল মত দেখা গেল। আসলে জঙ্গল নয়, খেজুর গাছের বাগান। বাগানের ভেতরে ছোট্ট পুকুর আছে। দলটার সঙ্গে আরও সানহারা যোগ দিল। খেজুরের বাগান পিছনে ফেলে একটা উপত্যকায় নামল ওরা। তারপর হঠাৎ মোচা আকৃতির জিনিসগুলো দেখতে পেল মহুয়া।

প্লেন থেকে এই খুদে পাহাড়গুলোকে আগেই দেখেছে মহুয়া। বিভিন্ন আকারের অদ্ভুতদর্শন পাহাড় এগুলো। কোন কোনটা এত ছোট, হাতে লম্বা পোল থাকলে লাফ দিয়ে পার হওয়া যাবে। বড়গুলো ফুটবল খেলার মাঠের মত। ছোটগুলোর উচ্চতা বেশি নয়, বড়গুলো চারশো ফুট পর্যন্ত উঁচু।

মরুভূমিতে লু হাওয়ার কারণে বালি ও পাথর বিচিত্র আকৃতি পায়। এগুলোর ভেতর মানুষ বাস করছে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলো মহুয়া। কয়েকটা মোচার গায়ে জানালা দেখা যাচ্ছে, আলো জ্বলছে ভেতরে।

তার হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। সানহারাদের বাসস্থান দেখে এতই অবাক হয়েছে, পালিয়ে যাবার কথা তার মনেই থাকল না। একটু পর কয়েকজন সানহারা ওকে একটা মোচার ভেতর নিয়ে এল। মহুয়া লক্ষ করল, মোচাগুলো সোপস্টোন দিয়ে তৈরি, খুবই নরম।

বড় একটা ঘরের ভেতর দিয়ে প্যাসেজে নিয়ে আসা হলো তাকে, সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা উঠতে হলো, তারপর সামনে পড়ল একটা দরজা। দরজা পেরিয়ে আরও এক প্রস্থ সিঁড়ি ভাঙতে হলো। এভাবে সব মিলিয়ে পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি টপকে অন্ধকার একটা কামরায় আনা হলো তাকে। ওর পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে, এক চুল নড়ছে না।

ভাবছে, এ কোথায় আনা হয়েছে তাকে?

'ভেতরে কিছু একটা ঠেলে দেয়া হয়েছে,' অন্ধকারে একটা মেয়েলি কণ্ঠ শোনা গেল। 'খাবার নাকি?'

'লীনা!' আনন্দে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল মহুয়া।

'ভাবী, তুমি!' কেঁদে ফেলল লীনা। অন্ধকার ঘরে পায়ের শব্দ উঠল। হাত বাড়াতেই লীনাকে ছুঁতে পারল মহুয়া। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা। 'ভাবী, শহীদ ভাই কোথায়?'

'এখানে তুমি একা নাকি, লীনা?' দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল মহুয়া।

'না। আমার সঙ্গে রাসেলও আছে।'

'রাসেল! রাসেল, তুমি এখানে?' পরম স্বস্তিতে অবশ হয়ে এল মহুয়া। 'আল্লাহর হাজারো শোকর! রাসেল, কেমন আছ ভাই তুমি?'

'আপনি সুস্থ তো, মহুয়াদি?' ভারী, গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল রাসেল। 'লীনা, ভাবীকে এদিকে নিয়ে এসে বসাও।'

কয়েক পা এগিয়ে মেঝেতেই বসে পড়ল মহুয়া। অন্ধকারে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না সে। 'এখানে তোমরা শুধু দু'জন?'

'না, আমিও আছি,' ডোনার গলা শোনা গেল।

'ডোনা, তুমি একা? তোমার সঙ্গীটি কোথায়, পেত্রা?'

লীনা বলল, 'পেত্রা কোথায় আমরা জানি না। তবে জানি সে আমাদের বন্ধু নয়।'

মহুয়া বিস্মিত হলো। 'মানে?'

'লেকের তলায় আমরা যখন আক্রান্ত হলাম, তখনকার কথা তোমার মনে আছে, ভাবী?' জিজ্ঞেস করল লীনা। 'মনে আছে, আমি চিৎকার করছিলাম?'

'হ্যাঁ, তোমার চিৎকার আমরা শুনেছি।'

'আমি চিৎকার করছিলাম শহীদ ভাইকে পেত্রা সম্পর্কে

সাবধান করার জন্যে,' বলল লীনা। 'পেত্রা আমার মাথায় একটা পাথর দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করছিল। চিৎকারটা করি তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার সময়। কিন্তু আসল কথা বলার আগেই সে আমার মাথায় আঘাত করে, আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এখানে জ্ঞান ফেরার পর দেখি রাসেল আমার শুশ্রূষা করছে।'

মহুয়া জানতে চাইল, 'তোমাকে ওরা কখন বন্দী করল, ডোনা?'

'ওই একই সময়ে,' বলল ডোনা। 'পেত্রা আমাকেও পাথর দিয়ে মেরেছে।'

রাসেল বলল, 'কাউন্ট টাটার কথাই তাহলে ঠিক। পেত্রাকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করছিল সে।'

'কিন্তু কাউন্ট টাটাও আমাদের বন্ধু নয়,' বলল মহুয়া। 'সে-ই তো আমাকে সানহারাদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

'ওহ্ গড! বলেন কি!'

কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল মহুয়া। আড়ি পেতে কেউ হয়তো ওদের কথা শুনছে, তাই শহীদের নামটা উচ্চারণ করল না। তবে রাসেল ফিসফিস করে প্রশ্ন করতে নিচু গলায় বলল, 'শহীদ এখন কোথায় বলতে পারব না। আমাকে বলে গেল, লীনাকে খুঁজতে যাচ্ছি।'

'তাহলে একমাত্র শহীদ ভাইই ধরা পড়েনি,' বলল রাসেল। 'উনিই এখন একমাত্র ভরসা আমাদের।'

'সানহারারা আমাদেরকে নিয়ে কি করবে, তোমরা কেউ আন্দাজ করতে পারো?' জানতে চাইল মহুয়া।

সবাই চুপ করে থাকল।

কয়েক সেকেন্ড পর রাসেল বলল, 'এই সানহারারা আসলে কি চায়? কারা ওরা?'

উত্তরটা কারও জানা নেই।

মহুয়া জানতে চাইল, 'কায়রো থেকে আমরা এসেছি ঘুমোন গ্রুপের পিছু নিয়ে। তাদের খবর কি? মোটকু থিয়োডর মোয়াসাসের?'

'ঘুমোন গ্রুপের কোন খবর আমাদের জানা নেই,' বলল রাসেল।

'আর কামাল সম্পর্কে? তার কোন খবর পাওনি তোমরা?'

'না,' ম্লান সুরে বলল রাসেল। 'কামাল ভাই সম্পর্কেও এখন পর্যন্ত কিছু শুনিনি আমরা।'

ঘরের ভেতর অন্ধকার হালকা হয়ে এল, ভোর হচ্ছে। দেয়ালের অনেক ওপরে একটা জানালা দেখতে পেল ওরা। এক সময় রোদ ঢুকল ঘরে। আর ঠিক তখনই বাইরের করিডর বা সিঁড়ি থেকে মারামারি ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে এল। কয়েকটা দরজা খোলার জোরাল আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

রাসেল ফিসফিস করল, 'সম্ভবত শহীদ ভাই বন্দী হয়েছে ওদের হাতে। উনি নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন।'

আশঙ্কায় রক্তশূন্য হয়ে গেল মহুয়ার চেহারা।

কিন্তু দেখা গেল রাসেলের ধারণা ভুল। ওদের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঠেলে দেয়া হলো শহীদকে নয়, কামালকে।

'কামাল ভাই, আপনি!' লাফ দিয়ে সিধে হলো রাসেল, দেখাদেখি মহুয়া আর লীনাও।

ওদেরকে দেখে কামালও কম বিস্মিত হয়নি। 'মহুয়া ভাবী, রাসেল, লীনা–সবাই এখানে! ওহ্ গড!'

'তোমার দাওয়াত পেয়ে ঢাকা থেকে কায়রোয় এলাম বেড়াতে, অথচ প্লেন থেকে নেমেই জানতে পারলাম তোমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে,' বলল মহুয়া। 'সেই থেকে আমরা সবাই তোমার খোঁজে কি না করছি, কোথায় না যাচ্ছি...'

'কি ঘটেছে, বলছি সব, একটু সময় দিন, ভাবী,' বলল কামাল। 'শহীদ কোথায়?'

'শহীদ ভাই আশপাশেই কোথাও আছে,' ফিসফিস করে বলল লীনা। 'আশা করি সময় মত তাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে। আমাদের সঙ্গে একটা আমেরিকান-আইরিশ মেয়ে আছে, যদিও বর্তমানে সে মিশরীয়। ডোনা মিলার। ওর দু'জন বন্ধু আছে। কাউন্ট টাটা আর মারিয়ো পেত্রা। কাউন্ট টাটা এই এলাকার উপজাতি সানহারাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। মারিয়ো পেত্রা এই এলাকাতেই আছে, তবে ঠিক কোথায় তা আমাদের জানা নেই।'

'এদের সম্পর্কে এত কথা কেন আমাকে শোনানো হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল কামাল।

'এইজন্যে যে এদের সম্পর্কে তুমি যদি কিছু জানো তো বলবে আমাদের।'

'এদের সম্পর্কে আমি...নাহ্, কিছুই আমি জানি না। নামগুলো এই প্রথম শুনছি।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। মহুয়া, রাসেল ও লীনা হতাশ বোধ করল। কাউন্ট টাটা, মারিয়ো পেত্রা আর ডোনার ভূমিকা এখনও সন্দেহমুক্ত নয়, বরং খুবই রহস্যময়। ওদের হতাশ হবার কারণ, এদের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কামালের কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

কামাল তার গল্পটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল ওদেরকে।

অ্যামেচার আর্কিওলজিস্ট হিসেবে আমেরিকায় একটা সেমিনারে গিয়েছিল সে। সেমিনার শেষ হতে কায়রোয় চলে আসে পিরামিড নিয়ে গবেষণা করার জন্যে। কায়রোয় আসার পরপরই প্রাচীন এক ফারাও সম্পর্কে অদ্ভুত একটা গল্প শোনে সে। এই ফারাও-এর নাম জুব্বাহ নেদ। সবার মুখেই এক কথা, জুব্বাহ

নেদ বহুকাল আগে মারা গেলেও, তার আত্মা নাকি পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। শুধু ফিরে আসেনি, ফিরে এসে যারা তারা সমাধি লুঠ করেছিল তাদেরকে এক এক করে নৃশংসভাবে খুন করে প্রতিশোধ নিচ্ছে।

এই গুজব কামালকে কৌতূহলী করে তোলে। মিশরের ন্যাশনাল মিউজিয়ামে প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটতে শুরু করে সে। জুব্বাহ নেদের নাম খুব একটা শোনা না গেলেও, কামাল জানতে পারে প্রাচীন মিশরে তাঁর অস্তিত্ব সত্যি ছিল। এরপরই তদন্ত শুরু করে সে। এই তদন্ত করতে গিয়েই তামামার সঙ্গে পরিচয় হয় তার। লোকমুখে শুনেছিল, হত্যা বা জুব্বাহ নেদের অভিশাপ সম্পর্কে তামামা তাকে অনেক তথ্য দিতে পারবে। কিন্তু তামামা অত্যন্ত চতুর লোক, মোটা টাকা ছাড়া মুখ খুলতে রাজি হয়নি। বুদ্ধি করে তাকে নিজের গাইড হিসেবে চাকরি দেয় কামাল, আভাসে জানিয়ে দেয় এই ফারাও সম্পর্কে সব কথা খুলে বললে এক হাজার ডলার বকশিশ দেয়া হবে তাকে। টাকার প্রতি তামামার লোভ ছিল অদম্য। অবশেষে এক রাতে মুখ খুলল তামামা।

কামাল জানতে পারল, জুব্বাহ নেদের অভিশাপে শুধু একটা দলের লোকজন খুন হচ্ছে, যারা ফারাও-এর সমাধির অমর্যাদা করেছিল। এই দলটার নামও জানতে পারে কামাল–ঘুমোন। লীডারের নামেই দলের নাম রাখা হয়েছে, বলা হয় তাকে।

'তাহলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, ঘুমোনের লোকজনই জুব্বাহ নেদের কবর লুঠ করেছিল।' রাসেল কামালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'কিন্তু কামাল ভাই, আপনি নিখোঁজ হয়ে গেলেন কিভাবে?'

নড়েচড়ে বসে আবার শুরু করল কামাল। টাকার লোভে বা ঝোঁকের মাথায় সব কথা বলে ফেলার পর সাংঘাতিক ভয় পেয়ে

যায় তামামা। এরপর নিশ্চয়ই সে গোপনে ঘুমোনের সঙ্গে দেখা করে, কারণ ঘুমোন গ্রুপের সে-ও একজন সদস্য ছিল। সম্ভবত নিজের বোকামি স্বীকার করে ঘুমোনের কাছে পরামর্শ চায় সে। ঘুমোন বুদ্ধি দেয়, কামালকে আটক করো। তাই করে ওরা। রাতের অন্ধকারে একটা নির্জন রাস্তায় তার মাথায় হকিস্টিক দিয়ে আঘাত করা হয়। কামাল জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাকে একটা ট্রাকে তুলে শহরের বাইরে আনা হয়, তারপর প্লেনে তুলে নিয়ে আসা হয় মরুভূমিতে। সেখান থেকে আরেকটা ট্রাকে তুলে সানহারাদের আস্তানায় আনা হয়েছে।

সানহারারা হলো ফারাও জুব্বাহ নেদের প্রজা। ফারাও বহুকাল আগে মারা গেলেও, আজও তারা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। সানহারাদের কিংবদন্তী অনুসারে, জুব্বাহ নেদই আসলে দ্বিতীয় তুতমোসিস, যিনি মিশর ত্যাগ করে বহুদূর এক যাদুর দেশে হিযরত করেন, সেখানে গড়ে তোলেন নতুন একটা রাজ্য। তাঁর উত্তরপুরুষরাই নাকি আজকের সানহারা উপজাতি। এই এলাকায় অসংখ্য মোচাকৃতি টিলা আছে, প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় এগুলোকেও পিরামিড বলা হত, যদিও এ-বিষয়ে আর্কিওলজিস্টদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

'বেশ, বুঝলাম, সানহারারা হয় জুব্বাহ নেদের উত্তরপুরুষ বা প্রজা, তো কি হলো?' জানতে চাইল মহুয়া।

'ওদের খেপে ওঠার কারণটা অন্তত জানা গেল, তাই না?' বলল কামাল। 'জুব্বাহ নেদের সমাধির অমর্যাদা হওয়ায় ওরা খুব রেগে গেছে।'

'তো?' মহুয়া ধৈর্য হারাচ্ছে না।

'তো কবর চোরদের ধরে ধরে বলি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা।'

'বলি দেবে? কিভাবে?'

'প্রাচীন মিশরীয় পদ্ধতিতে,' বলল কামাল। 'বিশদ বিবরণ দিচ্ছি না, অনেকেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।'

মহুয়ার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল লীনা, ভয়ে তার শরীরে কাঁপুনি উঠছে।

'আমরা কেন অসুস্থ বোধ করব?' জিজ্ঞেস করল রাসেল। 'সমাধিটা কি আমরা লুঠ করেছি?'

'না, আমরা জুব্বাহ নেদের সমাধি লুঠ করিনি,' স্বীকার করল কামাল। 'কিন্তু ঘুমোন লোকটা সানহারাদের বুঝিয়েছে আমরাই নাকি দায়ী।'

'কেন, সানহারাদের মাথায় ঘিলু নেই?' প্রতিবাদের সুরে বলল রাসেল। 'যে যা খুশি বলবে আর ওরা বিশ্বাস করবে, যাচাই করে দেখবে না?'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কামাল। 'জেট অর্থাৎ সর্দারদের এমনভাবেই বোঝানো হয়েছে যে ওরা আর কারও কথা শুনতে রাজি হচ্ছে না। ওদের একটাই দাবি, লুঠ করা সোনার অলঙ্কার আর প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট ফেরত দিতে হবে।'

ঘণ্টা দুয়েক পর সিঁড়ি থেকে আরেক দফা ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে এল। কামাল ও রাসেল কান পেতে শুনছে, চেহারায় উৎকণ্ঠা। ওদের সন্দেহ, শহীদও বোধহয় সানহারাদের হাতে বন্দী হয়েছে। একটু পর মাথা নাড়ল কামাল, বলল, 'কই, গোটা বিল্ডিংটা তো কাঁপছে না। তারমানে শহীদ নয়।'

দরজার বাইরে কাতর গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল। দড়াম করে খুলে গেল কবাট, ভেতরে কাউকে ছুঁড়ে দেয়া হলো। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কামাল, রাসেল, মহুয়া আর লীনা—খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সানহারারা জানত এরকম কিছু একটা ঘটবে, তাই তৈরি হয়েই ছিল তারা। সবার

হাতে চামড়ার তৈরি চাবুক, সপাং সপাং করে বাতাসে বাড়ি মারতে শুরু করল। আহত হবার ভয়ে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ওরা। দরজার কবাট আবার বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

এতক্ষণে নতুন অতিথির দিকে তাকাল ওরা। নতুন অতিথি, কাউন্ট টাটা, হাঁ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। পরিষ্কার বোঝা গেল, ওদেরকে দেখে ভয় পেয়েছে সে।

রাসেল বলল, 'এ তো দেখছি কাউন্ট!'

'কাউন্ট?' জিজ্ঞেস করল কামাল। 'আসল, নাকি নকল?'

ডোনা বলল, 'আসলই, তবে একটা কিন্তু আছে।'

মহুয়া কঠিন সুরে বলল, 'কামাল ভাই, রাসেল–তোমরা ওকে আচ্ছামত ধোলাই দিতে পারো? আমি ঘুমোন গ্রুপের লোক, সমাধি লুঠ করেছি, এ-সব কথা বলে এই শয়তানটাই আমাকে সানহারাদের হাতে তুলে দিয়েছে।'

'মিসেস শহীদ খানের এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি,' বলল ডোনা। 'কারণ কাউন্ট টাটা আমাকেও এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে।'

'ডোনা, মাই সুইট, তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না যে আমি...'

টাটাকে থামিয়ে দিয়ে ডোনা বলল, 'আমি কালা ও কানা হয়ে গেছি। শুধু মনে পড়ছে, লীনা আর আমাকে সানহারাদের হাতে তুলে দিয়েছ তুমি।'

কামালের কাঁধে একটা হাত রাখল রাসেল। 'আমাকে একটু জায়গা দিন, কামাল ভাই। ওর একটা হাত ছিঁড়ি আমি। ছেঁড়া হাতটা অপর হাতে ধরিয়ে দেব। ওটা নিয়ে খেলবে ও।'

'সেটা সত্যি দেখার মত একটা দৃশ্য হবে,' রাসেলকে উৎসাহ দিল লীনা।

কামালও একপাশে সরে গিয়ে বলল, 'হাতটা কোত্থেকে ভাঙবে–কব্জি, নাকি কনুই থেকে?'

'কাঁধ থেকে,' বলে টাটার দিকে এগোল রাসেল।

'থামো!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টাটা। 'আগে আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের বন্ধু! তোমরা আমাকে ভুল বুঝছ। আসলে তো আমি তোমাদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম!'

রাসেল থমকে দাঁড়াল। 'চালাকি করার জায়গা পাও না, না? বাঁচাবার চেষ্টা করছিলে? তোমার ষড়যন্ত্রেই আজ আমরা এখানে বন্দী...'

'আর কোন উপায় ছিল, ফর গড'স সেক!' কাতর কণ্ঠে বলল টাটা, চেহারায় ব্যাকুলতা। 'আমার পরিচয়টা দিই, তাহলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি একজন সিক্রেট এজেন্ট।'

'সিক্রেট এজেন্ট? কিসের সিক্রেট এজেন্ট?'

'ইন্টারপোলের। তোমরা সবাই জানো, ইন্টারপোল দুনিয়ার সব দেশে কাজ করতে পারে। আমাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে মিশরে পাঠানো হয়েছে। আমার কাজ–ঘুমোনকে খুঁজে বের করা।'

'মানে?'

'ঘুমোন। রহস্যময় যা কিছু ঘটছে, প্রতিটি ঘটনার জন্যে সেই তো দায়ী। আমার মিশন ছিল তার আসল পরিচয় জানা। তদন্ত করতে গিয়ে আমি জানতে পারি, সানহারারা তাকে চেনে। কাজেই আমি একটা ঝুঁকি নিই–ওদের হাতে তোমাদের তুলে দিই, মিছিমিছি বলি যে আমিও ঘুমোন-এর লোক। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করে। এর একটু পরই আমি জেনে ফেলি ঘুমোনের আসল পরিচয়।'

'কি?'

'ঘুমোন কে আমি এখন জানি।'

'কে?'

'ঘুমোন এখানে পৌঁছেছে। আমাকে একজন ভুয়া সদস্য

হিসেবে চিহ্নিত করে সে। সেজন্যেই এখানে আমাকে বন্দী করা হয়েছে।'

'ঘুমোন কে?'

ভূতে পাওয়া মানুষের মত ছটফট করছে টাটা। 'তোমরা জানো, ওরা আমাদের নিয়ে কি করতে যাচ্ছে? স্রেফ বলি দেবে। এক এক করে জবাই করা হবে! প্রাচীন মিশরে বলি দেয়ার চল ছিল। বলি দেয়ার আগে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। ফারাও জুব্বাহ্ নেদের সমাধির সামনে এই মুহূর্তে সেই আয়োজনই চলছে। বিশ্বাস করো, আমরা একজনও বাঁচব না...'

কামাল বলল, 'রাসেল, হাত না কি যেন ভাঙবে বলছিলে, ভাঙো। আমার ধারণা, লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।'

এগিয়ে এসে টাটার ঘাড়টা শক্ত হাতে চেপে ধরল রাসেল। 'এই যে, কাউন্টের বাচ্চা! এক কথা ক'বার জিজ্ঞেস করব? বাঁচতে চাইলে এখনও সময় আছে। বলো, ঘুমোন কে?'

'মারিয়ো!' ফিসফিস করে বলল টাটা। 'মারিয়ো পেত্রাই হলো ঘুমোন।'

নয়

শুকনো একটা নালার তলায় সারাটা দিন লুকিয়ে থাকল মারিয়ো পেত্রা। সঙ্গে পানি নেই, তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। মনেও জ্বলছে অশান্তির আগুন।

বিকেলের দিকে আকাশে কিছু মেঘ জমেছিল, দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাতেও দেখা গেছে, কিন্তু রুবা আল খালিতে এক ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরেনি।

সন্ধের পর অন্ধকার গাঢ় হতে নালা থেকে উঠে এল পেত্রা। সে এমনিতেই অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির লোক, এই মুহূর্তে রীতিমত অসুস্থবোধ করছে। প্লেনটা কোথায় আছে জানে সে, ধীর ও নিঃশব্দ পায়ে সেদিকেই এগোচ্ছে। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার কারণ হলো, দিনের বেলা সন্দেহ হচ্ছিল কেউ তার ওপর নজর রাখছে।

আসলে প্লেনটার কাছে যাওয়া বোকামি হয়ে যাবে, বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। তা অবশ্য সে যাচ্ছেও না–প্লেনটাকে পাশ কাটিয়ে আরও একশো গজের মত এগোতে হবে তাকে, যেখানে আরও একটা নালা আছে।

নালাটা খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা সময় বেরিয়ে গেল। কাল রাতে এখানে একটা জিনিস লুকিয়ে রেখে গেছে সে। অন্ধকারে জায়গাটা চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। স্তূপ করা কয়েকটা নুড়ি পাথর সরিয়ে বালি খুঁড়ল সে, গর্ত থেকে বের করে আনল বড় আকারের মেটাল বক্সটা। চ্যাপ্টা মেটাল বক্সটা দেখতেই শুধু বড়, ওজন খুব বেশি নয়। বাক্সের ওপর থেকে বালি ঝেড়ে একপাশে সরিয়ে রাখল পেত্রা, তারপর আরেকটা কেস বের করল। এটা ছোট, লেদারের তৈরি, কাঁধে ঝোলাবার জন্যে স্ট্র্যাপ আছে।

বড় বাক্সটার গায়ে হাতল আছে। সেটা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করছে সে–সামান্য একটু ঝাঁকাল, কান ঠেকিয়ে শুনল কিছু। সন্তুষ্টবোধ করল পেত্রা। নালা থেকে উঠে এল সে। কিছু দূর সাবধানে হাঁটল, তারপর দ্রুত হলো গতি। সময় বয়ে চলেছে। মাঝরাতের খানিক আগে মোচাকৃতি উঁচু টিলাগুলো দেখতে পেল

সে, চারদিক থেকে ঘিরে আছে তাকে। গাছপালাও এদিকে কম নয়। বেশিরভাগই খেজুর বাগান। তবে কমলারও চাষ হয়।

একটা কংক্রিটের নালায় হোঁচট খেলো পেত্রা। এই নালার সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয়, পাথর দিয়ে ঢাকা। একটা পাথরের স্ল্যাব সরিয়ে আঁজলা ভরে পানি খেলো সে। তারপর আবার হাঁটা ধরল। কোথায়, কোনদিকে যাচ্ছে সে জানে। বড় বাক্সটা খুব সাবধানে বহন করছে।

অবশেষে একটা টিলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পেত্রা। আশপাশের আর সব টিলার চেয়ে এটা ছোট। নরম সোপস্টোন নয়, এটা শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি, যার ফলে মরুর লু হাওয়া আর আগুনের মত গরম রোদ কয়েক হাজার বছর ধরে চেষ্টা করেও কোন ক্ষতি করতে পারেনি। পেত্রা আর্কিওলজিস্ট নয়, তবে এটুকু বোঝার ক্ষমতা তার আছে যে এই টিলাটা প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের তৈরি। ঘটনাটা পাঁচ হাজার বছর আগেকার, শুনেছে পেত্রা।

ছোট, মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু একটা টিলার আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আছে পেত্রা, তাকিয়ে আছে কালজয়ী বড় টিলাটার দিকে, কপালে চিন্তার রেখা। এখান থেকে টিলার প্রবেশপথ অর্থাৎ মুখটা দেখতে পাচ্ছে সে। অনেকটা সুড়ঙ্গের মত। পাথরের স্ল্যাবগুলো বারো ফুট পুরু, একেকটা ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা।

সুড়ঙ্গের মুখটা খিলান আকৃতির। সেখানে একজন প্রহরীকে দেখা গেল, এইমাত্র ভেতর থেকে বেরিয়েছে। লোকটা সানহারা। মাথায় লাল পাগড়ি, পাগড়ির কিনারায় সোনালি বর্ডার। সোনালি বর্ডার দেয়া লাল পাগড়ি শুধু সর্দার অর্থাৎ জেটরা ব্যবহার করে।

জায়গাটার রাজকীয় ভাব মুগ্ধ করল পেত্রাকে। পিরামিড দেখলেও এই একই অনুভূতি হয় তার, দম বন্ধ হয়ে আসে। চাঁদের আলোয় সুড়ঙ্গের মুখে খোদাই করা হায়রাগ্লিফিক্স পরিষ্কার

পড়তে পারল সে। এই লেখা পাঁচ হাজার বছর আগে খোদাই করা হয়েছে। আগে হয়তো আরও গভীর ছিল। লেখাটা আধুনিক ভাষায় রূপান্তর করলে দাঁড়ায়–

'আমার আত্মা তোমাকে জড়িয়ে ধরে পুড়িয়ে মারবে
যদি তুমি আমার এই হাড়গুলো নাড়াচাড়া করো।'

এই অনুবাদ তার নিজের করা নয়। লোকমুখে শুনেছে সে। আজ মনে হয়, না শুনলেই ভাল হত। আজ পর্যন্ত অন্যায় অপরাধ যা কিছু করেছে, তার জন্যে এই লেখাটা দায়ী।

পেত্রা নিজেকে চেনে। সে খুব ভীতু প্রকৃতির মানুষ। সে নিষ্ঠুর নয়, হৃদয়হীন নয়, এমন কি অসৎও নয়–নয় মানে, ছিল না। সেজন্যেই ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তার দ্বারা এ-ধরনের অপরাধ ঘটল কিভাবে!

তবে এ-কথাও ঠিক যে একবার জড়িয়ে পড়ার পর পিছিয়ে আসার বা বেরিয়ে আসার কোন উপায় খোলা ছিল না। ছিল না, নেইও। এখন আর সে পালাতে চায়ও না। বরং বীভৎসা শেষ পরিণতিটা দেখারই ইচ্ছে। ভাগ্যগুণে সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, যদি সে রক্ষা পায়, পরিচিত জগৎ ছেড়ে অনেক দূরে কোথাও চলে যাবে সে, বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে একা নিভৃতে। মনে যদি শান্তি ফিরে আসে, ভাল। আর তা না হলে আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

আত্মহত্যা করতে তার খুব ভয় লাগে। তবু সে চেষ্টা করে দেখবে। একটা অ্যাক্সিডেন্টের আয়োজন করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন হবে না।

এ-সব কথা ভাবছে পেত্রা, এই সময় হঠাৎ লোহার মত শক্ত একজোড়া হাত পড়ল তার গায়ে।

নিজেকে ছাড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো পেত্রা.

অবশেষে হার মেনে নিয়ে পেশীতে ঢিল দিল। তার কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে এনে শহীদ বলল, 'আমরা নিচু গলায় কথা বলতে পারি।' পেত্রার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল ও।

'গার্ড আমাদের কথা শুনতে পেলে কি হবে জানেন? এই সমাধির ধারে কাছে আসা নিষেধ। আমরা এখানে আছি জানতে পারলে কোন প্রশ্ন করবে না, স্রেফ খুন করে ফেলবে।'

'বিপদ হলে আমি সামলাব,' বলল শহীদ। মেটাল বক্সটায় একটা হাত রাখল ও। 'তামামা আর জেফরির মৃত্যুর জন্যে এটাই তাহলে দায়ী, কি বলো?'

পেত্রা কিছু বলল না। ধরা পড়ার পর দর দর করে ঘামছে সে। শহীদ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। এক সময় দম ফিরে পেয়ে পেত্রা বলল, 'আপনি আমাকে অনেকক্ষণ ধরে অনুসরণ করছেন।'

'হ্যাঁ, সেই নালা থেকে।'

'তারমানে আপনি সারাদিন প্লেনটার ওপর নজর রাখছিলেন।'

'হ্যাঁ, সারাদিন,' বলল শহীদ। 'তবে প্লেনের ওপর নয়, তোমার ওপর নজর রাখছিলাম।'

'আমাকে আপনি কখন দেখতে পান?'

'কাল রাতে।'

পেত্রা আবার চুপ করে গেল। এখন শুধু ঘামছে না, কাঁপছেও। এক সময় ফিসফিস করে বলল, 'ঘুমোনের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি আজ পাঁচ বছর।'

'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

'প্রথম দিকে ব্যাপারটা দারুণ লেগেছিল। ছোটবেলা থেকেই মিশরে আসা-যাওয়া ছিল। প্রাচীন মিশরের ওপর লেখাপড়া করেছি—সব ক'জন ফারাওকে চিনি, জানি কোথায় কার সমাধি আছে। রাজা-মহারাজাদের ইতিহাস পড়া ছিল, জানি কিভাবে তাঁরা রাজা-মহারাজা হয়েছে। তাই ঘুমোনের প্রস্তাবটা সাংঘাতিক

মনে ধরে আমার।'

'কি ছিল সেই প্রস্তাব?'

'ঘুমোনের প্ল্যান ইউনিক,' বলল পেত্রা। 'পৃথিবীর যে-কোন দেশে উচ্চাভিলাষী মানুষের অভাব নেই–তারা রাজা, প্রধান মন্ত্রী, প্রিমিয়ার, প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক প্রশাসক হতে চায়। ঘুমোনের প্ল্যান হলো, এরা যে যা হতে চায় তা হতে সাহায্য করা। আমার ধারণা, ঘুমোনের এই প্ল্যান সম্পর্কে আপনি জানেন।'

'একা শুধু আমি নই–আমেরিকা, ব্রিটেন ও রুশ ইন্টেলিজেন্সও জানে। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই জানে।'

'জানে, কিন্তু ঘুমোনকে বাধা দেয়ার কোন উপায় তাদের জানা নেই।'

শহীদ চুপ করে থাকল।

'লোকজনকে রাজা বানাবার এই আইডিয়াটা আমাকে আকৃষ্ট করে,' বলল পেত্রা। 'কিন্তু জন্মগতভাবেই আমি খুব নার্ভাস টাইপের মানুষ। কেউ যদি আমাকে কাপুরুষ বলে, আমি প্রতিবাদ করব না। রক্ত দেখলে আমি অসুস্থ বোধ করি। ঘুমোনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পর বুঝতে পারলাম, এই খুন-খারাবি আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু তখন আর বেরিয়ে আসার পথ খোলা ছিল না।'

কিছুক্ষণ কথা বলল না ওরা, কারণ সমাধির সুড়ঙ্গের মুখে গার্ড আবার ফিরে এসেছে। তবে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে চলে গেল লোকটা।

'কিং-মেকিং সহজ কাজ নয়, অঢেল টাকা লাগে,' বলল পেত্রা। 'ফান্ড পাবার জন্যে সমাধি লুঠ করার প্ল্যান করল ঘুমোন। কয়েক মণ সোনা পাওয়া গেল, সঙ্গে বেশ কিছু আর্টিফ্যাক্ট। ঘুমোন জানাল, এ-সব বিক্রি করতে পারলে এক বছর চলার মত টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু সমাধি থেকে চুরি করা জিনিস বিক্রি করা

সহজ কাজ নয়। লুঠ করা সোনা আর আর্টিফ্যাক্ট আলেকজান্দ্রিয়ার একটা গুদামে লুকিয়ে রাখা হলো। অল্প কিছু বিক্রি করা সম্ভব হয়, বাকি সব চুরি হয়ে গেছে...'

'চুরি হয়ে গেছে?' শহীদ বিস্মিত। 'কবে? কে চুরি করল?'

'বিক্রি করার জন্যে একজন ক্রেতাকে ওগুলো আমরা দেখাই,' বলল পেত্রা। 'ক্রেতার পরিচয় সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না আমাদের। মাত্র দশ হাজার ডলারের একটা চেক দেয় সে, অগ্রিম হিসেবে। সোনা আর আর্টিফ্যাক্টের দাম ধরা হয় ত্রিশ লাখ মার্কিন ডলার। কিন্তু লোকটা বাকি টাকা দিই-দিচ্ছি করে বারবার শুধু সময় নিতে শুরু করল।'

'তারপর?'

'মাত্র এক কি দেড় হপ্তা আগে শুনতে পেলাম, আলেকজান্দ্রিয়ার গুদাম থেকে সমস্ত সোনা আর আর্টিফ্যাক্ট চুরি হয়ে গেছে। সেই রহস্যময় ক্রেতারও কোন সন্ধান নেই।'

'তারমানে চোরের ওপর বাটপাড়ি, কেমন?' শহীদ মুচকি একটু হাসল। 'তোমাদের সোনা আর আর্টিফ্যাক্ট কে চুরি করেছে আন্দাজ করতে পারি। তবে সে প্রসঙ্গ এখন থাক। তুমি আমাকে সানহারাদের সম্পর্কে বলো।'

'সানহারাদের সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানে,' বলল পেত্রা। 'তার কারণ ওরা অনেকটা বেদুইনদের মত জীবনযাপন করে, আজ এখানে তাঁবু ফেলে তো কাল ওখানে। তবে বছরের একটা সময় ফারাও জুব্বাহ নেদের সমাধির কাছে ফিরে আসে তারা। নেদ হলেন ওদের প্রাচীন রাজা, পূর্ব-পুরুষ। সে যাই হোক, নেদের সমাধি লুঠ করে ঘুমোন। দলে আমিও ছিলাম।'

'বেশ। তারপর কি হলো?'

'সুড়ঙ্গের মুখে ওই লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন—"আমার আত্মা তোমাকে জড়িয়ে ধরে পুড়িয়ে মারবে, যদি তুমি আমার এই

হাড়গুলো নাড়াচাড়া করো"। বললে বিশ্বাস করবেন, এই লেখাটা পড়েই আমার মাথায় আইডিয়াটা আসে?' মেটাল বক্সটায় হাত বোলাল সে। 'ওই লেখা আমার জন্যে অভিশাপ। ওটা দেখেই এই অস্ত্রটা ব্যবহার করার কথা প্রথম ভাবি আমি।'

নিচু গলায় একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে পেত্রা।

সমাধি লুঠ করার পর অপরাধ বোধে আক্রান্ত হয় পেত্রা। কিন্তু ঘুমোনের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। দলের অনেক গোপন তথ্য জানত সে। পালাবার চেষ্টা করলে ঘুমোন স্রেফ তাকে খুন করত। তাছাড়া, পুলিসের কাছে গিয়ে কোন লাভও হত না। ঘুমোন তার অপরাধের এমন কোন প্রমাণ রাখেনি যে পুলিস তার বিরুদ্ধে একটা কেস দাঁড় করাতে পারবে। ঘুমোন অত্যন্ত চালাক, সে তার পরিচয় কখনোই কারও কাছে ফাঁস করেনি।

মেটাল বক্সটায় হাত রাখল শহীদ। 'এটা সম্পর্কে বলো–জিনিসটা কি অ্যাটমসফেরিক সিলেনটারেইটা?'

অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠল পেত্রা। 'ওহ্, গড! আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ, জানি।'

'কিন্তু কিভাবে জানলেন?' পেত্রা হতভম্ব। 'আমি ছাড়া আর কারও তো জানার কথা নয়!'

শহীদ বলল, 'তামামার লাশ কয়েক ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করার সুযোগ পাই আমি। যেভাবে সে মারা যায়, সম্ভাব্য মাত্র একটা উপসংহারেই পৌঁছুতে হয়। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগে, রীতিমত ফ্যানটাসটিক, তাই কাউকে কিছু না বলে চুপ করে থাকি আমি। এ ভয়ও ছিল যে আমি বোধহয় কোথাও ভুল করছি।'

'কিন্তু আসলে ব্যাপারটা মোটেও ফ্যানটাসটিক কিছু নয়।'

'না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই ব্যাখ্যা মেনে নেবে না। এমন

কি পুলিসও হজম করতে পারবে না।'

'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক।'

শহীদ বলল, 'সাধারণভাবে পরিচিত সিলেনটারেইটার যে-সব নমুনা আমরা দেখতে পাই, তার সবই সাগরে পাওয়া যায়। ওগুলো বেশিরভাগই হয় ট্র্যান্সপারেন্ট, নয়তো সেমি-ট্র্যান্সপারেন্ট। প্ল্যাঙ্কটন সদৃশ্য অর্গানিজমই ওদের খোরাক।'

'কিন্তু এটা জেলিফিশ নয়।'

'অবশ্যই জেলিফিশ নয়। তবে ধরন বা চরিত্র একই। সাগরে সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত যারা তারা জানে যে প্রায় স্বচ্ছ কিছু জেলিফিশ আছে যা গায়ে লাগলে হু হু করে জ্বালা করে। তবে জেলিফিশ শুধু পানিতেই ভেসে থাকে।'

'হ্যাঁ, শুধু পানিতে,' বলল পেত্রা। 'আমার এটাও, এই অস্ত্রটা, ভেসে থাকে—পানিতে নয়, বাতাসে।'

'তুমি কি এটা আবিষ্কার করেছ, নাকি ডেভলপ করেছ?'

'দুটোই। কঙ্গোর ওলেসি উপত্যকার নাম শুনেছেন আপনি?'

'না।'

'কঙ্গোর ওলেসি উপত্যকায় মাটির তলা থেকে গ্যাস বেরোয়, সেই গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যায়,' বলল পেত্রা। 'এ-ধরনের একটা জায়গা আমেরিকাতেও আছে। কলোরাডোয়। ওখানে মারা যায় ভেড়া। ওলেসি উপত্যকার কথা শুনে ওখানে আমি গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, জিনিসটা গ্যাস নয়। ওটা ছিল এক ধরনের এরিয়াল সিলেনটারেইটা। জেলিফিশও বলতে পারেন, তবে এটা পানিতে নয়, বাতাসে ভাসে। কিছুটা সঙ্গে করে নিয়ে আসি আমি। তারপর কয়েক বছর ধরে গবেষণা করি। ব্যাপারটা গোপন রাখি, কারণ হয়তো অপরাধপ্রবণতা আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। শুধু খুন-টুন সহ্য করতে পারি না।'

'এটা তুমি ব্যবহার করো কিভাবে?' জানতে চাইল শহীদ।

'স্রেফ ছুঁড়ে দিই। বাতাসে ভর করে সাঁতার কাটে।'

'গতি?'

'খুবই মন্থর। এই ধরুন হাঁটা-গতি।'

'বিষটা কতটুকু মারাত্মক?'

'খুব বেশি নয়, জেলিফিশের মতই হবে।'

শহীদ মাথা নাড়ল। 'জেলিফিশের সংস্পর্শে মানুষ মারা যায় না।'

'আমি যতটুকু জানি, দুটোই এক জাতের বিষ।'

'তুমি ওটা ছোঁড়ো কিভাবে?'

দ্বিতীয় কেসটা ছুঁলো পেত্রা। 'এই লেদার কেসে একটা এয়ার পিস্তল আছে। জিনিসটা পিস্তলে ভরি। একটা ক্যাপসুল আর কি। পিস্তলের ট্রিগার টানলে ক্যাপসুল ছোটে। খুদে কাঁচের তৈরি ক্যাপসুল। কোথাও লাগলে ভেঙে যায়।'

'হলুদ রঙটা আসলে কি? ওটার কি কোন গন্ধ আছে?'

'হলুদ পদার্থটা আসলে জেলিফিশের খাদ্য। হ্যাঁ, গন্ধ আছে।'

'তোমার এই অস্ত্র কত দূর যায়?'

'বিশ ফুটের বেশি নয়।'

'তারমানে তামামা আর জেফরি যখন খুন হয়, ওদের বিশ ফুটের মধ্যেই ছিলে তুমি?'

'আরও কাছাকাছি ছিলাম,' বলল পেত্রা। 'সত্যি কথা বলতে কি, খোলা দরজার ঠিক বাইরে। সাধারণত যখন কেউ কথা বলে, তখনই এয়ার-গানের ট্রিগার টেনে দিই, ফলে শব্দটা শোনা যায় না। ভিক্টিমের মুখে হলুদ দাগ দেখা দেয়ায় সবাই তাই নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে শব্দ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।'

'পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিলেই জিনিসটা ছোটে?'

'হ্যাঁ। ছোটে খাবারের লোভে। ওই খাদ্য গ্রহণ করার সময়ই

ভিক্টিম মারা যায়।'

'ওটা তুমি ফিরিয়ে আনো কিভাবে?'

'সেটাও পানির মত সহজ। বাক্সের ভেতর খানিকটা হলুদ পদার্থ ঢেলে দিই। তাতেই ফিরে আসে ওটা। ফিরে এলেই বাক্সটা আমি বন্ধ করে দিই।'

'বাহ্! মানুষ মারার কি চমৎকার ব্যবস্থা!'

'আমাকে নিয়ে এখন আপনি কি করবেন?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল পেত্রা।

পেত্রার ঘাড়ে একটা হাত রাখল শহীদ। 'এর আগে তুমি বলেছ, সমাধির গার্ড লোকটা একজন সর্দার।'

'হ্যাঁ। একজন জেট।'

'সে কি ইংরেজি জানে?'

'ইংরেজি ছাড়া ফ্রেঞ্চও জানে ওরা,' বলল পেত্রা। 'কেন?'

'এসো আমার সঙ্গে,' বলে পেত্রার ঘাড়ে চাপ দিল শহীদ, দাঁড় করাল তাকে। 'ওদের সঙ্গে কথা বলব আমরা।'

'মাথা খারাপ! ওরা স্রেফ খুন করে ফেলবে! এমনিতে ওরা সরল, কিন্তু সমাধির অসম্মান করা হয়েছে শুনলে...'

'ধানাইপানাই ছাড়ো!' ধমক দিল শহীদ। 'সানহারাদের হাতে আমার লোকজন বন্দী। তোমার বিনিময়ে ওদেরকে আমি মুক্ত করব। এসো!'

জোর করেই পেত্রাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে শহীদ।

পেত্রা বলল, 'আপনি তো একবারও জিজ্ঞেস করলেন না ঘুমোন আসলে কে!'

'তা আমি আগেই জেনেছি,' শুরু করল শহীদ, কিন্তু ওর বাকি কথা চাপা পড়ে গেল অকস্মাৎ মাথার ওপর চলে আসা বিশাল এক প্লেনের গর্জনে। প্লেন থেকে সার্চলাইট ফেলা হলো সমাধির ওপর। কয়েক মুহূর্তের জন্যে গোটা এলাকা চোখ-ধাঁধানো আলোয়

উদ্ভাসিত হয়ে থাকল।

স্থির পাথর হয়ে গেছে শহীদ আর পেত্রা। ক্রমশ দূরে মিলিয়ে গেল প্লেনের গর্জন। 'কি ব্যাপার? কোত্থেকে এল প্লেনটা?'

শহীদ আপনমনে বিড়বিড় করল, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানা যাবে। ওটা কোথাও ল্যান্ড করতে গেল, আপাতত এটুকুই শুধু আন্দাজ করতে পারছি।'

পুরো একটা দিন পার হবার পর রাতটাও শেষ হতে চলেছে, অথচ মুক্তি পাবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, স্বভাবতই খুব মুষড়ে পড়েছে বন্দীরা। পরিমাণে প্রচুর খাবার দেয়া হয়েছে ওদেরকে, কিন্তু সে-সব মানসম্পন্ন না হওয়ায় কেউই তেমন কিছু মুখে দেয়নি।

বন্দীদের মধ্যে ডোনার অবস্থাই সবচেয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। সবার কাছ থেকে দূরে, একা বসে আছে সে; মাঝে মধ্যে আপনমনে বিড় বিড় করছে, চেহারা ফ্যাকাসে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

ভোরের দিকে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হলো ডোনা। হঠাৎ লাফ দিয়ে সিধে হলো সে, ছুটে দরজার কাছে চলে এল, দরজার গায়ে ছোট্ট খোলা জানালায় মুখ ঠেকিয়ে চিৎকার জুড়ে দিল, 'ঘুমোন! ঘুমোন! সানহারাদের হাত থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও! তোমার প্রতিটি নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি!'

রাসেল হতভম্ব। জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ তুমি? এর মানে কি?'

ডুকরে কেঁদে উঠল ডোনা। 'আমিও ওদের একজন।'

'ওদের একজন মানে? কাদের?'

'আমি ঘুমোন গ্রুপের সদস্যা।'

ধীরে ধীরে গল্পটা বেরিয়ে এল। বাবা প্রচুর টাকা রেখে গেলেও বেহিসেবী খরচ করায় কিছুদিনের মধ্যেই হাত খালি হয়ে যায় ডোনার। টাকার অভাবে চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে সে। এই সুযোগে তাকে ঘুমোন গ্রুপে নাম লেখাবার প্রস্তাব দেয়া হয়।

মোটা বেতনের লোভ দেখিয়ে ডোনাকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। মধ্যপ্রাচ্য আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয় তাকে। সে-সব দেশে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে, তাদেরকে হরতাল ডাকার পরামর্শ দেয়, প্রস্তাব দেয় বোমাবাজি করে রাজধানীর জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলার। বোমা আর অস্ত্র ঘুমোন গ্রুপই সরবরাহ করবে, তার প্রস্তাবে এই প্রতিশ্রুতিও ছিল। ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা তার প্রস্তাবে সাড়া দেয়। অস্ত্র আর গোলাবারুদের বিনিময়ে প্রচুর টাকা পায় ঘুমোন।

ডোনার হাত ধরে এক পাশে টেনে আনল কাউন্ট টাটা। 'ডোনা, ডোনা, শান্ত হও, প্লীজ! কি বলতে কি বলছ তা বোধহয় তুমি নিজেও জানো না। আমি ভাবতেই পারি না...'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডোনা আবার চিৎকার করে উঠল, 'তুমি চুপ করো! তুমিই তো এর মধ্যে জড়িয়েছ আমাকে। ঘুমোনের হয়ে কাজ করার প্রস্তাবটা তুমিই আমাকে দিয়েছিলে। বলেছিলে, পানির মত সহজ কাজ, কিন্তু লাখ লাখ টাকা ইনকাম।'

রাসেল জানতে চাইল, 'কাউন্ট টাটাও তাহলে ঘুমোন গ্রুপের একজন সদস্য?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ডোনা।

রাসেল ও কামাল মারমুখো হয়ে টাটার দিকে এগোল। 'তুমি তাহলে আমাদেরকে মিথ্যে কথা বলেছ!' শার্টের আঁস্তিন গুটাতে গুটাতে বলল রাসেল।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল টাটা। 'প্লীজ, দয়া করো! প্লীজ, আমাকে মেরো না তোমরা!' করুণ সুরে মিনতি করছে সে। 'ওরা যখন এখানে আমাকে আনল...'

'এখানে তোমাকে কেন ওরা আনল?'

'ঘুমোন আর আমাকে বিশ্বাস করে না, তাই,' বলল টাটা। 'সে আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছে। আমার বিরুদ্ধে সানহারাদের খেপিয়ে তুলেছে। আমি জানতাম, তোমরা আমার আসল পরিচয় জানতে পারলে মেরেই ফেলবে।'

'ঘুমোন এখন কোথায়? সানহারারা তার কথা শুনছে কেন?' জানতে চাইল কামাল।

'ঘুমোনকে তোমরা ধরতে পারবে না,' বলল টাটা। 'ঘণ্টা দুয়েক আগে প্লেনের আওয়াজ শুনেছ, মনে আছে? আমার সন্দেহ, ওই প্লেন নিয়ে পালিয়ে গেছে ঘুমোন।'

হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল রাখল রাসেল। সবাই চুপ করে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। অনেক লোক উঠে আসছে। একটু পরই কামরার দরজা খুলে গেল। মাথায় লাল পাগড়ি পরা একজন সর্দার নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিল, বাকি সানহারারা পাথুরে মূর্তির মত তার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

সর্দারের বক্তব্য অনুবাদ করল কামাল। 'সূর্য ওঠার পর আমাদেরকে বলি দেয়া হবে।'

'সূর্য উঠতে আর কত দেরি?' জিজ্ঞেস করল লীনা।

'পনেরো মিনিট,' বলল কামাল।

লীনা ফুঁপিয়ে উঠল। তার মাথায় একটা হাত রেখে মহুয়া বলল, 'শান্ত হও, বোন। তোমার শহীদ ভাই এখনও ধরা পড়েনি। সে নিশ্চয়ই...'

ফারাও জুব্বাহ নেদের মোচা আকৃতির সমাধি ভোরের প্রথম

আলোয় পবিত্র ও রহস্যময় একটা গাম্ভীর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। ছোট-বড় অসংখ্য টিলার মাঝখানে ওটা, কোনটাই খনন করা হয়নি। কয়েক মিলিয়ন বছর আগে এলাকা জুড়ে নরম পাথরের স্তর ছিল, সেগুলো কালের আঁচড়ে ক্ষয়ে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে কঠিন শিলা, তারই ফলশ্রুতি এই মোচা আকৃতির কাঠামো বা টিলা।

সংখ্যায় প্রায় এক হাজার হবে এখানে জড়ো হয়েছে সানহারারা। অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে শুধু পুরুষরা, মহিলা ও শিশুদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। তবে তারাও আছে, শুধু কাছে আসতে পারছে না। দূরে, যে-সব টিলার গায়ে দরজা-জানালা আছে, সেখানে কৌতূহলী মহিলা আর শিশুরা ভিড় করেছে। অবশ্য অত দূর থেকে মানুষ বলি দেয়ার অনুষ্ঠান তারা দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।

সমাধির সামনে, সুড়ঙ্গের মুখে, সম্মানীয় অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সরাসরি খিলানের নিচে। সম্মানীয় অতিথি বলতে মোয়াসাস আর তার সঙ্গীরা। সানহারারা তাদেরকে খুব খাতির-যত্ন করছে।

চারদিকে তাকিয়ে শহীদ বা মারিয়ো পেত্রাকে কোথাও দেখতে পেল না রাসেল। কামালের সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করল সে। দু'জনকেই সন্তুষ্ট দেখাল।

'মোটকু মোয়াসাস,' বলল মহুয়া। 'ওই লোকটাই ঘুমোন নয় তো?'

ডোনা মাথা নেড়ে বলল, 'আমার মনে হয় না। পেত্রা সম্পর্কে যে যাই বলুক, আমার ধারণা তার মনটা আসলে ভাল। আমি বলতে চাইছি, পেত্রা অন্তত রক্ত লোলুপ পাষণ্ড নয়। তার ঘুমোন হবার কোন সম্ভাবনা নেই।'

'পেত্রা হয়তো তোমাকে বোকা বানিয়েছে,' বলল টাটা। 'সে

হয়তো ভাল একজন অভিনেতা।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'ডোনা, ঘুমোন কে তা কি তুমি সত্যি জানো না?'

'সত্যি জানি না,' আবার মাথা নেড়ে বলল ডোনা।

চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে কাউন্ট টাটা, জিভের ডগা বের করে ঠোঁট চাটছে ঘন ঘন। 'তোমাদের বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান কোথায়? এই বিপদের সময় সে যদি সাহায্য না করে, আর কখন করবে!'

'শহীদ বসে নেই, এটুকু আমি বলতে পারি,' বিড়বিড় করল কামাল।

মহুয়া বলল, 'কিন্তু শহীদ একা এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে কি-ই বা করতে পারবে!'

খিলানের নিচে, সুড়ঙ্গের মুখে, লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছিল ওদেরকে। লাইন ভেঙে কামালের নেতৃত্বে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে ওরা। ওদের কাছাকাছি বসে রয়েছে ঘুমোন গ্রুপ–থিয়োডর মোয়াসাস আর তার সঙ্গীরা। সানহারারা বুঝতে না পারলেও, কামাল ও রাসেলের চোখে ধরা পড়ল ব্যাপারটা–সবাই তারা সশস্ত্র, পরনের কাপড়চোপড় এখানে সেখানে ফুলে আছে।

শিরদাঁড়া খাড়া, পা দুটো ফাঁক, একজন সানহারা সর্দার প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হাত তুলে সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল সে, তারপর গুরুগম্ভীর ভরাট গলায় কথা বলতে শুরু করল–গলা তো নয়, যেন বিশ-ওয়াট আউটপুট সহ পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম।

লোকটা সানহারা ভাষায় কথা বলছে। রাসেল, মহুয়া ও লীনা ভাষাটা বোঝে না। কামাল বলল, 'সর্দার ফারাও জুব্বাহ নেদের

জীবনী বর্ণনা করছে। আমরা যেমন শুনেছি তার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

ভাষণের শেষ দিকে সর্দার সমাধির পবিত্রতা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হবার অনুরোধ করল। বলল, ফারাও জুব্বাহ নেদের মর্যাদা তারা নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারপর, অকস্মাৎ, হুঙ্কার ছাড়ল সে। তার সেই গর্জন প্রতিধ্বনি তুলছে।

'নিশ্চয়ই সমাধি লুঠের প্রসঙ্গে কিছু বলছে,' মন্তব্য করল রাসেল।

'ঠিক ধরেছ,' নিশ্চিত করল কামাল।

উত্তেজিত সর্দার ক্রোধ দমন করল, আচরণে ফিরে এল গম্ভীর ভাব। মন দিয়ে শুনছে কামাল। বিড়বিড় করল সে। 'সর্বনাশ!'

'কি হলো? কি বলছে সর্দার?' রাসেল উদ্বিগ্ন।

'এতক্ষণ তো যুক্তি দিয়েই কথা বলছিল,' বলল কামাল। 'এখন সম্ভবত প্রলাপ বকছে।'

'মানে?'

'সর্দার বলছে, বলি দেয়ার আগে ছোট্ট একটা আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে তারা,' ব্যাখ্যা করল কামাল। 'আনুষ্ঠানিকতা মানে, ফারাও-এর আত্মাকে একটা সুযোগ দেয়া হবে—ওই আত্মা শরীরী রূপ ধারণ করে অপরাধীদের আঘাত করবে। সর্দারের বক্তব্য হলো, এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কে অপরাধী, কে নয়।'

রাসেল বলল, 'এটা তো আমাদের জন্যে সুখবর, কামাল ভাই! যেহেতু আমরা সমাধি লুঠ করিনি, কাজেই আমাদের কোন ভয় নেই।'

'কিন্তু আত্মা শরীরী রূপ ধারণ করবে কিভাবে? বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা স্রেফ বুজরুকি। সানহারারা নিশ্চয়ই কোন

চালাকির আশ্রয় নিতে যাচ্ছে। নিজেদের কাউকে উদ্ভট বেশভূষা পরিয়ে হাজির করবে, তাকে দিয়ে বলাবে আমরাই সমাধি লুঠ করেছি।'

'আমার খুব আশ্চর্যই লাগছে,' বলল মহুয়া। 'তোমার বন্ধু কি কোন বিপদে পড়ল?'

মাথার ওপর দুই হাত তুলে আকাশের দিকে তাকাল সর্দার। দেখাদেখি তার দু'পাশে দাঁড়ানো ছ'জন সানহারাও তাই করল। চারদিকে অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল।

সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল কাউন্ট টাটা। অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল সে।

চমকে লাফ দিল রাসেল, ঘুরে গেল আধ পাক।

টাটার মুখে হলুদ দাগ ফুটে উঠেছে। এই একই দাগ দেখা গিয়েছিল তামামা ও জেফরির মুখে।

মুখে হাত দিয়ে খানিকটা রঙ মুছল টাটা, হাতটা চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল। হঠাৎ করেই তার আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেল। বন্দীদের লাইন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সে, ঘুমোন গ্রুপকে লক্ষ্য করে ছুটছে, সেই সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'ওরা আমাদের সম্পর্কে জানে! এটা আমাদের বিরুদ্ধে একটা ফাঁদ! একটা ষড়যন্ত্র! তোমরা অস্ত্র বের করো, গুলি করে পালাবার রাস্তা বের করো!'

ঘুমোন গ্রুপের সদস্যরা টাটার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। হঠাৎ দেখা গেল তাদের সবার হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে।

'ওহ্, গড!' বিড়িবিড় করল রাসেল। 'টাটাই আসলে ঘুমোন!'

এরপর একের পর এক দ্রুত কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। কাউন্ট টাটা ওরফে ঘুমোনের নির্দেশ শুনে তার দলের লোকজন থিয়োডর

মোয়াসাসের নেতৃত্বে লুকানো আগ্নেয়াস্ত্র বের করল। সেগুলো বেশিরভাগই রিভলবার আর পিস্তল, তবে ব্যারেল কাটা দু'একটা রাইফেল ও শটগানও আছে। বের করতে পারলেও, একটা অস্ত্রও তারা ব্যবহার করতে পারল না।

আশপাশে কঠিন পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট অসংখ্য বালির বিস্তৃতিও রয়েছে, অকস্মাৎ সেগুলো ফাঁক হয়ে গেল, বালির তলা থেকে উঠে এল সশস্ত্র সানহারারা, সবার মাথায় নল-খাগড়ার তৈরি হ্যাট। বালির তলায় লুকিয়ে থাকার সময় তারা শ্বাস নিচ্ছিল ওই নল-খাগড়ার ফাঁপা নল দিয়ে, মুখে ছিল মুখোশ। কারও কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র নেই, শুধু তরোয়াল আর ছোরা। তবে সংখ্যায় তারা কয়েকশো। ঘুমোন গ্রুপকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে ধরল, কেউ একটা গুলিও করতে পারল না।

রাসেল ছুটল টাটাকে ধরার জন্যে। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে সে-ই ঘুমোন।

মারিয়ো পেত্রাকে নিয়ে সমাধি থেকে বেরিয়ে এল শহীদ, সঙ্গে সানহারাদের কয়েকজন সিনিয়র সর্দার। ওদের সামনে রয়েছে বিশালদেহী এক ব্যক্তি, পরনে কালো ও ঢোলা আলখেল্লা, মাথায় ইস্পাত রঙের শিরস্ত্রাণ, বুকে বর্ম, হাতে শোভা পাচ্ছে একটা লেযার গান। আগন্তুকের প্রকাণ্ড মুখে ধ্যানমগ্ন একটা ভাব সবার দৃষ্টি কেড়ে নিল। প্রথমে তাকে কেউ চিনতে না পারলেও, মহুয়ার ভুল হয়নি। 'দাদা!' শব্দটা বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল মুখ থেকে। তারপর আর একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না, বিস্ময়ে একেবারে বোবা হয়ে গেছে।

মহুয়ার মুখে 'দাদা' শুনে রাসেল, কামাল ও লীনা নতুন দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুকের দিকে। এবার ওরাও তাকে চিনতে পারল।

'কুয়াশা এখানে!' কামাল স্তম্ভিত। 'কিভাবে...কখন এল?'

রাসেল ধাওয়া করছে কাউন্ট টাটাকে। কিন্তু ভিড়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল সে। দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ডোনা। 'টাটাকে ধরো! ও পালাচ্ছে!'

কিভাবে যেন তিনটে পিস্তল আর একটা রাইফেল যোগাড় করেছে টাটা। ডোনার চিৎকার শুনে বন করে ঘুরল সে, তারপর একটা গুলি করল। তবে লক্ষ্যস্থির করেনি, গুলিটা এক গজ পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। সামনে বাধা দেখে দিক পরিবর্তন করল সে, ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতর। চারদিকে ধুলোর মেঘ উড়ছে, লোকজন ছুটোছুটি করছে, ফলে খুব কম লোকই দেখতে পেল টাটা সমাধির ভেতর ঢুকছে।

ধীরে ধীরে শান্ত হলো সানহারারা। ঘুমোন গ্রুপের সবাইকে নিরস্ত্র করল তারা। কয়েক মিনিটের মধ্যে ধুলোর মেঘ কেটে গেল। মহুয়া আর লীনা দেখল ঘুমোন গ্রুপের কয়েকজন আহত হয়েছে, মারা গেছে একজন।

সমাধির ভেতর থেকে ভেসে এল গোলাগুলির শব্দ। এক মিনিট পর চারজন সানহারা বেরিয়ে এল সুড়ঙ্গ থেকে। তিনজন আহত হয়েছে, একজন ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তার মুখ থেকে শোনা গেল, ভেতরে একজন সর্দারকে জিম্মি করেছে টাটা ওরফে ঘুমোন।

সানহারারা খেপে উঠল। সবাই তারা একসঙ্গে সমাধির ভেতর ঢুকতে চায়। হাত তুলে তাদেরকে শান্ত হতে অনুরোধ করল কুয়াশা। আঞ্চলিক আরবী ভাষায় উপস্থিত সবার উদ্দেশে দু'একটা কথা বলল সে। 'ঘুমোন গ্রুপ ধরা পড়েছে, কাজেই এখন আর সমাধির অমর্যাদা হবার কোন ভয় নেই। সমাধির ভেতর একা ঘুমোন ঢুকেছে, কাজেই তাকে বের করা কঠিন কোন কাজ নয়।

'উপস্থিত সানহারাদের প্রতি আমার বক্তব্য, এই ঘুমোন গ্রুপই

ফারাও জুব্বাহ্ নেদের সমাধি লুঠ করেছিল। কিন্তু তাতে সত্যিকার অর্থে আপনাদের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ লুঠ করা প্রায় সমস্ত সোনা আর আর্টিফ্যাক্ট আলেকজান্দ্রিয়ার একটা গুদামে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে তা আমি সংগ্রহ করে আপনাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। প্রশ্ন করতে পারেন, এই কাজ কেন আমি করলাম। এর উত্তর হলো–এক, ফারাও জুব্বাহ্ নেদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, তাঁর সমাধির পবিত্রতা রক্ষা করা কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল আমার; দুই, ভুল করে আপনারা আমার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে বন্দী করেছেন, তাদেরকে মুক্ত করার জন্যেও এই কাজ করতে হয়েছে আমাকে। সানহারাদের প্রতি আমি সত্যি কৃতজ্ঞ, কারণ দেখতে পাচ্ছি আমার আপনজনেরা কেউ মারা যায়নি বা আহত হয়নি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কুয়াশা থামতেই সানহারারা একযোগে চিৎকার করে উঠল, 'কুয়াশা দীর্ঘজীবী হোন!'

ভিড় ঠেলে কামালের পাশে চলে এল শহীদ। ওকে ছেঁকে ধরল মহুয়া, লীনা আর রাসেল। শহীদ বলল, 'টাটা বা ঘুমোন সমাধির ভেতর ব্যারিকেড দিয়েছে।'

রাসেল নিচু গলায় বলল, 'দেখা যাক তাকে বের করার কি ব্যবস্থা করা যায়।'

সানহারারা কুয়াশাকে নিয়ে নাচতে নাচতে আরেক দিকে চলে গেল। শহীদ, কামাল, রাসেল ও পেত্রা এগোল সমাধির দিকে। সুড়ঙ্গের ভেতর সাবধানে ঢুকল ওরা। সামনেই একটা প্যাসেজ, অপরপ্রান্তটা প্রায় অন্ধকার, তারপর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক।

রাসেল গায়ের শার্ট খুলে একটা ডালের মাথায় ঝোলাল। 'গুলি করো!' বলেই শার্টটা বাঁকের ওদিকে বাড়িয়ে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বুলেট ছুটে এল. ডালের মাথা থেকে ছিটকে

পড়ে গেল শার্ট। 'হাতের টিপ মন্দ নয় দেখা যাচ্ছে!'

একটা মেটাল কেসে হোঁচট খেলো রাসেল। 'এটা কি?'

বাঁকের এদিকে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছে ওরা টাটার কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায়, এই ফাঁকে মেটাল বক্স রহস্য সম্পর্কে রাসেলকে জ্ঞানদান করছে পেত্রা। 'এটা এক ধরনের জেলিফিশই,' বলল সে। কিন্তু রাসেল শুধু মাথা নাড়ছে, অর্থাৎ জিনিসটাকে জেলিফিশ বলে মানতে রাজি নয় সে। হাল না ছেড়ে পেত্রা তখন বলল, 'তবে এই জেলিফিশের বৈশিষ্ট্য হলো, এটা পানিতে নয়, বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। অর্থাৎ এক ধরনের গ্যাসই বলা যায় জিনিসটাকে, হাইড্রোজেনের মতই। বাতাসে শুধু ভেসেই থাকে না, ওপরে উঠতে পারে, নিচে নামতে পারে, খোরাকের গন্ধ পেলে সেদিকে ছুটতে পারে।'

শহীদ বলল, 'আমরা বরং সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে সানহারাদের সঙ্গে কথা বলি। ওরা যদি অনুমতি দেয়, সমাধির ভেতর ধোঁয়া ঢুকিয়ে টাটাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা যায়।'

কামাল বলল, 'টিয়ার গ্যাসও ব্যবহার করা যেতে পারে।'

কামাল, পেত্রা আর শহীদ সুড়ঙ্গ ধরে সমাধির বাইরে বেরিয়ে এল। ভেতরে শুধু রাসেল থাকল পাহারায়। অবশ্য একটু পর তার সঙ্গে যোগ দিল লীনাও।

পেত্রা জিজ্ঞেস করল, 'ডোনাকে নিয়ে আপনারা কি করবেন, মি. শহীদ?'

'তোমার কোন পরামর্শ আছে?' জানতে চাইল শহীদ।

'ওর যদি কোন শাস্তি প্রাপ্য হয়, সেটা আমি ভোগ করতে চাই, কারও যদি আপত্তি না থাকে।'

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'তারমানে মেয়েটাকে তুমি ভালবাসো?'

ম্লান সুরে পেত্রা বলল, 'হ্যাঁ, ভালবাসি। তবে একটা অনুরোধ, এই কথাটা দয়া করে ডোনাকে জানাবেন না।'

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কামাল।

'কারণ ব্যাখ্যা করা কঠিন,' বলল পেত্রা। 'ওকে যে আমি ভালবাসি, এ-কথা বহুবার বলেছি। কিন্তু এখন আমার ডেভলপ করা এয়ার-জেলিফিশের কথা শুনবে ও, তাই না? ওর চোখে আমি একটা ক্রিমিন্যাল হিসেবে চিহ্নিত হব। কাজেই ওকে নিয়ে আমার অনুভূতির কথা এখন আর শোনাতে চাই না...'

সমাধির ভেতর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল। যেন একটা বিড়ালের বাচ্চা মিঁউ মিঁউ করছে। ঘুরে ছুটল শহীদ, ওর পিছু নিয়ে বাকি সবাইও। বিড়ালের কাতর ডাক ক্রমশ বাড়ল। শব্দটা এমনই, অসুস্থ বোধ করল ওরা।

রাসেল আর লীনা এখনও সেই বাঁকটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুই হাত মেলে ওদের পথ আটকাল রাসেল। 'দাঁড়ান! সামনে এগোবেন না!'

'কেন?'

আঙুল দিয়ে মেটাল বক্সটা দেখাল রাসেল। 'এটার ভেতর যে জিনিস ছিল তা নিশ্চয়ই এখন সমাধির ভেতর ঢুকে পড়েছে।'

'হোয়াট! জিনিসটা বাক্সের ভেতর নেই?'

'মনে হচ্ছে নেই।'

'কিন্তু থাকার তো কথা!'

'কেন নেই তা তো বলতে পারব না,' শান্ত সুরে বলল রাসেল, চেহারা দেখে মনে হলো ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।

পেত্রাকে গ্রেফতার করা হলো। শহীদ বলল, 'তোমাকে কায়রো পুলিসের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'ঠিক আছে, আমার যে শাস্তি হয় মাথা পেতে নেব আমি,' বলল পেত্রা। 'কিন্তু...কিন্তু ডোনাকে কি অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়া যায় না?'

'না। ঘুমোনকে সহায়তা করার অপরাধে তার বিচার হবে, তাকেও আমি গ্রেফতার করে কায়রোয় নিয়ে যাচ্ছি।'

রাসেল ব্যঙ্গ করে বলল, 'কায়রো পুলিস তোমাদেরকে সম্ভবত মেডেল দেবে।'

গম্ভীর হলো পেত্রা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মেডেল, তার সঙ্গে বিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।'

কুয়াশাকে ওরা চোখের দেখাই দেখল, তার সঙ্গলাভের আশা পূরণ হলো না। সানহারাদের নিয়ে নিজের প্লেনের কাছে চলে গেছে সে, কয়েক মণ সোনা আর প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট প্লেন থেকে নামানোর কাজ তদারক করবে।

সেদিন দুপুরে সানহারারা দুম্বা আর খাসী জবাই করে বিরাট এক ভোজের আয়োজন করল। প্রধান অতিথি কুয়াশা। সানহারারা তাকে এমনভাবে সারাক্ষণ ঘিরে থাকল, একমাত্র মহুয়া ছাড়া তার কাছে আর কেউ ঘেঁষতেই পারল না।

সবাইকে নিয়ে বিকেলে প্লেনে চড়ল শহীদ। কায়রোয় পৌঁছে পুলিসের হাতে পেত্রা আর ডোনাকে তুলে দিল ওরা।

বিচারে চোদ্দ বছরের জেল হলো পেত্রার। ডোনা কোন খুন-টুন করেনি, তাকে পাঁচ বছরের জেল দেয়া হলো।

পুরো বাহিনী নিয়ে এক মাস কায়রোয় বেড়াল শহীদ। দেশে ফেরার পথে প্লেনে পাশাপাশি সীটে বসল কামাল ও লীনা। আরেক সারির সীটে পাশাপাশি বসে আছে শহীদ আর মহুয়া। লীনা আর কামালের দুই হাত এক হতে দেখে মুচকি একটু হাসল মহুয়া, তারপর শহীদের একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল, মাথাটা এলিয়ে দিল ওর কাঁধে। ফিসফিস করে বলল, 'সব ভাল যার শেষ

ভাল, কি বলো? আমি তো ভাবতেই পারিনি যে সবাই বহাল তবিয়তে দেশে ফিরতে পারব।'

'কুয়াশা সাহায্য না করলে এ-যাত্রা রক্ষা পেতাম কিনা সন্দেহ,' বলল শহীদ। 'অথচ কি ভাগ্য দেখো, কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পর্যন্ত পেলাম না।'

মহুয়া অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। 'কিন্তু দাদা তো বললেন অন্য কথা। উনি পৌঁছাবার আগেই নাকি তুমি সানহারাদের বোঝাতে পেরেছিলে যে আমরা সমাধি লুঠ করিনি...'

'বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম,' বলল শহীদ। 'কুয়াশা লুঠ করা সোনা আর আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে হাজির হওয়ায় কাজটা আমার জন্যে সহজ হয়ে যায়।'

'দাদা আসলে আমাদেরকে অসম্ভব ভালবাসেন,' বলল মহুয়া। 'দেখো না, নিজের গবেষণার কাজ ফেলে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্যে ছুটে এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, কুয়াশার এই ঋণ কোনদিনই আমরা শোধ করতে পারব না।'

***

কুয়াশা-৭৮

হলুদ মৃত্যু

শেখ আবদুল হাকিম

বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। আসলে জিনিসটা কি? একজন ফেরাউনের অতৃপ্ত আত্মা? তাঁর অভিশাপ? মিশরের রাজধানী কায়রোয় নিখোঁজ হয়ে গেল কামাল। মহুয়া, রাসেল আর লীনাকে নিয়ে তদন্ত শুরু করল প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। একে একে ওদের সঙ্গে যোগ দিল কাউন্ট টাটা, বাকপটু পেত্রা, ধনীর দুলালী ডোনা। জানা গেল সমস্ত রহস্যের মূলে রয়েছে ঘুমোন নামে এক লোক। প্রশ্ন হলো, কে সে? টাটা? পেত্রা? নাকি কুয়াশা? আসুন ওদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে আমরাও তদন্তে অংশগ্রহণ করি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০